ছোটদের প্রিয়নবী

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ছোটদের প্রিয়নবী

হযরত মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

প্রকাশনায়

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

৫০, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ কাল ❑ নভেম্বর— ২০০০

প্রকাশক ❑ মোঃ শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, ফোন :৭১১১৯৯৩, স্বত্ব ❑ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট, ৫০ বাংলাবাজার, প্রচ্ছদ ❑ মোঃ রফিক উল্যাহ, দি ডিজাইনার, মুদ্রণে ❑ আল-মদীনা প্রিন্টিং প্রেস, তাঁতী বাজার, ঢাকা।

মূল্য ❑ ৫০.০০ টাকা মাত্র।

www.nagorikpathagar.org

উপহার

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

জনাব মুহম্মদ শাহীদুর রহমান ও তাঁর সহধর্মিনী মিসেস খালেদা খাতুন-কে চিরস্থায়ী শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ—

মহান মাহাত্মা যারা মানবের হিতাকাঙ্ক্ষী এ জগৎ- মাঝে।
তাহাদের স্মৃতিকথা এ-হৃদয় মনমাঝে সদাই বিরাজে।।
জীবনে-চলার পথে অন্ধকার- এ জীবনে দিল যারা আলো।
আলো দিয়ে ভাষা দিয়ে প্রেরণা যুগিয়ে যারা বাসিয়াছে ভালো।।
সে কথা ভোলার নয় ভুলিব না কোনো দিন ভুলিবার নয়।
জীবন-স্মৃতির মাঝে সেই কথা লেখা জানি রবে নিশ্চয়।।
এ জীবন ক্ষুদ্র অতি সেই কথা চিরকাল জানি আমি দীন।
শ্রদ্ধাস্পদে গ্রন্থখানি উৎসর্গিত করি আমি জালাল উদ্দীন।।

২৫. ০৭. ২০০০

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

শোকর আলহামদুলিল্লাহ। প্রকাশিত হল আমাদের পাবলিকেশনস্‌ের জীবনী সিরিজের অন্যতম গ্রন্থ ছোটদের প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আমাদের সুবৃহৎ 'প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর দরবারে লক্ষ-কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আমাদের জীবনী সিরিজের অন্যতম গ্রন্থ ঃ 'শায়খ নিজামউদ্দীন আউলিয়া জীবন ও কর্ম'ও ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ইসলামী চিন্তাচেতনাজাত ধ্যান-ধারণা সমুন্নত রাখার জন্য ইসলামী জগতের মহাপুরুষদের জীবন চরিত অধ্যয়ন ও নিজ-নিজ জীবন ও কর্মে তার প্রতিফলন আজ বড়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এছাড়া গত্যন্তর নেই, কেননা, একদিকে বিজাতীয় কু-সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতির ঘৃণ্য প্রভাব অন্যদিকে মুসলিম নামধারী একশ্রেণীর অকালকুষ্মাণ্ড ও কূপমণ্ডুক— যারা বিজাতীয় ভাবধারা ও ইসলাম, মুসলমান, মনুষ্যত্ব ও মানবতার ঘৃণিত শত্রুদের উচ্ছিষ্টে লালিত, তারা এ ভূখণ্ডে অনবরত ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণার প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত— বলা যায়, তারা ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেই শত্রুদের ঘৃণ্য অপপ্রচারের প্রভাব বলয় থেকে আমাদের এদেশের বিশ্বমুহম্মদীয় পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য ও নিবেদিতপ্রাণ আদর্শবাদী মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-লেখক-বুদ্ধিজীবী-চিন্তাবিদদের শ্রমসাধ্য সাধনার ফসল এ শ্রেণীর গ্রন্থগুলি আমরা জাতির খিদমতে প্রকাশ করে চলেছি। সকলের সহযোগিতা ভিন্ন এ পথ বড়ই কঠিন এবং কণ্টকাকীর্ণ; এ সকল গ্রন্থাধ্যায়নের মাধ্যমে সে পথে আমাদের চলার পথের প্রেরণা লাভ করতে হবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সামনে স্বচ্ছ-সুন্দর পবিত্র জীবনের দিশা দেখিয়ে দিতে হবে।

ধন্যবাদ এ গ্রন্থের লেখক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক মুহাম্মাদ জালালউদ্দীন বিশ্বাসকে। তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রিয়নবীর জীবনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করেছেন। বিষয় ও ভাষার উপর অসাধারণ অধিকার ব্যতীত এ ধরনের কাজ মোটেও সম্ভব নয়।

ধন্যবাদ লেখককে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে। যাদের সহযোগিতায় এ গ্রন্থ অনতিবিলম্বেই প্রকাশ সম্ভব হল। এ প্রচেষ্টা সফল হলেই আমাদের শ্রম ও সাধনা হবে সার্থক।

বিনীত

মোঃ শিহাবউদ্দীন

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একখানি জীবনী গ্রন্থ এক নিমেষে বা একদিনে বা একমাসে বা এক বছরে বা সারা জীবনে এক আধবার বা বারবার বা বহুবার পাঠ করলেই প্রিয়নবীর জীবনী পাঠ ও তাঁর প্রতি সমস্ত দায়িত্ব পালন বা হক আদায় সম্পূর্ণ হয়ে যায় না। তাঁর জীবনী অধ্যয়ন, তা গভীরভাবে অনুধাবন, গভীর অন্তরে তার লালন-পালন, চিন্তন, মনন ও কথনের দ্বারা প্রচারকরণ, ইসলাম-বিরোধীদের ঘৃণ্য-অপপ্রচারের অপনোদন, নীতিও আদর্শবাদের ক্ষেত্রে তাঁর দেখানো পথ অনুধাবন— এসবই হল তাঁর জীবনী পাঠের সাথে সাথে তাঁর প্রতি যথার্থ হক পালন।

তবে, সেই সাথে এ সত্য অবলোকন ও অনুধাবনও একান্ত প্রয়োজন যে, প্রিয়নবীর জীবন ও সাধনার মূল নীতি কি, তাঁর আদর্শ কি, তাঁর শিক্ষা কি, ইহকাল ও পরকালে তাঁর ঠিকানা কি, কিভাবে তাঁর জীবন ও সাধনাকে নিজের জীবনে প্রতিফলন করতে হবে, তাও নিশ্চিতভাবে জানতে হবে, অনুধাবন করতে হবে ও ব্যক্তিজীবনে তাঁর প্রতিফলন ঘটাতে হবে, এসব না জানলে প্রিয়নবীর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন একেবারেই বিফল, একেবারেই ব্যর্থ। তা ইহ-পরকালীন জীবনে কোনো সুফল বয়ে আনবে না। এখন দেখা যাক, প্রিয়নবীর শিক্ষা, নীতি ও আদর্শানুসারে, অমুসলমান কে বা মুসলমানই বা কে অথবা অমুসলমান ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য কী? এ প্রশ্নের জবাব খুব স্পষ্টভাবে এবং নিখুঁতভাবে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে এ গ্রন্থের পাঠক বা বিশ্বমুহম্মদীয় পরিবারের সদস্যরা ইসলামের মর্মবাণীকে সার্থকভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে যে, একজন মুসলমানও মানুষ, একজন অমুসলমানও মানুষ। তাদের পরস্পরের আকার-আকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির মধ্যে বাহ্যিক কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব যে, কে অমুসলমান আর কে মুসলমান? এক কথায়, এর সহজ উত্তর হল এ পার্থক্য বিশ্বাসগত। তারপরে আসে সামাজিক আচার-বিচার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা, ধর্মীয় আচরণ ও অন্যান্য বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ধ্যান-ধারণাা, বিষয় ও প্রসঙ্গ। অর্থাৎ একজন মুসলমান যা বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাসের কারণেই সে মুসলমান। আর একজন অমুসলমান যা বিশ্বাস করে, তার সেই বিশ্বাসের কারণেই সে অমুসলমান। অর্থাৎ মুসলমান যা বিশ্বাস করে অমুসলমান তা বিশ্বাস করে না, আর অমুসলমান যা বিশ্বাস করে মুসলমান তা বিশ্বাস করে না। নিজ নিজ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একে বলা হয় ঈমান এবং আকিদা। এই ঈমান এবং আকিদাগত বিশ্বাসই হল মুসলমানও অমুসলমানের মধ্যেকার মূল পার্থক্য।

এখন দেখা যাক মুসলমান কে, আর অমসুলমানই বা কে? এক কথায় মুসলমান হল সেই ব্যক্তি, যে মুখের কথা ও রক্তমাংসসহ আন্তরিকতা ও আত্মগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী বা রাসূল বলে স্বীকার করে। এ হল

www.nagorikpathagar.org

ঈমানের প্রথম বাক্য বা ভিত্তি। সেই ভিত্তি বা বিশ্বাসের উপরেই মুসলমানদের সমস্ত ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও ঈমান আকিদা সুপ্রতিষ্ঠিত। এ কথাকে যে অবিশ্বাস করে, সে মুসলমান নয়। অর্থাৎ বিশ্বাসগত পার্থক্যই হল মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যকার মূল পার্থক্য। এ পার্থক্য হবে যেমন বাহ্যিক, আন্তরিক ও আভ্যন্তরিক, তেমনি পার্থক্য সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, মৌখিক, আদর্শিক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও।

এখন বুঝতে হবে যে, মুসলমানের বিপরীত বা বিপক্ষে যে অমুসলমানদের অবস্থান, তাদের সামগ্রিক পরিচয় কী, আর মুসলমানদের সাথে মূল পার্থক্যও দূরত্বটা কোথায়? অমুসলমান বলতে তাদের বোঝায়, সমাজে, দেশে বা বিদেশে যারা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, ইহুদি ইত্যাদি নামে পরিচিত। এখন অতি-সংক্ষেপে এদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ ও সামাজিক অবস্থানের সাথে মুসলমানদের পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। প্রথমেই আসা যাক, হিন্দু প্রশ্নে। সাধারণভাবে হিন্দু বলতে আমরা মূর্তিপূজক বা পৌত্তলিকদের বুঝে থাকি। পবিত্র কুরআনে এদের 'মুশরিক' (অংশীবাদী বা পৌত্তলিক), 'মালাউন' (বা নিকৃষ্ট), কাফির (খোদাদ্রোহী বা আদেশ লঙ্ঘনকারী), জাহিল (মূর্খ বা অন্ধকার যুগের রীতিনীতি অনুসরণকারী ও পালনকারী) এবং কখনো যা এদের জালিম (অত্যাচারী) বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, আইয়্যামে জাহেলিয়া বা অন্ধকার যুগের রীতিনীতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে এক হাতে গড়া প্রাণহীন মূর্তির উপাসনা প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর নবী ও রসূল– একথা স্বীকার করে তাঁর প্রদর্শিত পথে আগমনকারীরা হল আলোর পথের যাত্রী— অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোয় আগমনকারী। অর্থাৎ, মূর্তিপূজা পরিত্যাগকারী মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ও মানসিক ধর্মীয় বিশ্বাসও অনুভূতির ব্যাপারটা একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ, থুথু নিক্ষেপ করা বা বমি করে উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করা। মুসলমানরা পৌত্তলিকতাকে পরিত্যাগ করেছে অর্থাৎ, থুথু বা পেটের বদহজমজাত উচ্ছিষ্টকে– সেই থুথু যেমন পুনরায় গ্রহণ করা যায় না, এবং বমি করা উচ্ছিষ্ট কে গলাধঃকরণ করা যায় না, তেমনি মুসলমান হওয়ার পর পৌত্তলিতায় ফিরে যাওয়া যায় না। যারা যায়, তারা হচ্ছে সেই কুকুরের সমান, যে জন্তুটি বমি করে সেই উচ্ছিষ্ট পুনরায় গলাধঃকরণ করে।

এ সমস্ত সংক্ষিপ্ত উদাহরণের দ্বারা এটা বোঝা গেল যে, একজন হিন্দুর সাথে একজন মুসলমানের পার্থক্য কোথায়। এবং পার্থক্যের ভিত্তিটাই বা কী?সেজন্য পবিত্র কুরআন বা ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ যে, পৌত্তিলিক বা মুশরিক মুসলমানের আন্তরিক বন্ধু হয়না— সে জন্য সতর্ক করেও দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, মুসলমানের সাথে পৌত্তলিকতার পার্থক্য এটাই।

অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে, হিন্দু, মুশরিক বা পৌত্তলিকদের সাথে ঈহুদীদের আশ্চর্য ও অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সভ্য পৃথিবীতে ইহুদিরা

www.nagorikpathagar.org

যেমন বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের অবমাননা করেছে, তেমনি হিন্দুরা পবিত্র বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছে।

মনে রাখতে হবে যে, প্রিয়নবী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেদিনকার মুশরিক বা পৌত্তলিকরা যে আচরণ করেছিল, ঠিক একই আচরণ উপমহাদেশের হিন্দু-পৌত্তলিক-মুশরিকরা মুসলমানদের সাথে করে থাকে। সেদিন ইসলামের নিবেদিত প্রাণ সাহাবি হযরত বিলাল, হযরত আলী, হযরত উসমান প্রমুখ সাহাবিদের সাথে যে আচরণ ও জলুম অত্যাচার করেছিল, আজকের পৌত্তিলিক-মুশরিক-হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে সেই আচরণই করে থাকে। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, সেদিনকার ইসলাম বিরোধী পৌত্তলিকদের সাথে আজকের ইসলাম-বিরোধী পৌত্তলিকদের কোনও পার্থক্য নেই। সুতরাং সেদিনের শত্রু আজকের শত্রু, আজকের শত্রু সেদিনকার শত্রু— এ শত্রুতা অভ্যন্তরীণ বা আন্তরিক বিশ্বাসগত শত্রুতা। সুতরাং আকারে-প্রকারে, আহারে-বিহারে, ভাষা-ইত্যাদিতে পার্থক্য না থাকলেও পার্থক্য রয়েছে বিশ্বাসগত। যেখানে অন্তরের বিশ্বাসগত সততাই পরস্পরের বন্ধু হওয়ার প্রধানতম শর্ত সেখানে। অভ্যন্তরীণ ও ধর্মীয় বিশ্বাসগত পার্থক্যই এ বন্ধুত্বের প্রধানতম অন্তরায়। আর এই অন্তরায় বা বিশ্বাসগত বাধা থেকেই গড়ে উঠেছে ভিন্ন-ভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়। আর যাবতীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদের মূল উৎস হল অভ্যন্তরীণ ও ধর্মীয় বিশ্বাস। এ বিশ্বাস যেমন মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় পারস্পরিক বিভেদ ধ্বংস করা। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানকেই এরই আলোকে তার বন্ধু অথবা শত্রুকে জানতে, চিনতে এবং অনুধাবন করতে হবে। ব্যর্থ হলে নিজেদের ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে।

বৌদ্ধ, জৈন ও খ্রিস্টান ইত্যাদি জনগোষ্ঠীও ধর্মমত বিশ্বাসের দিক থেকে পৃথক।

পবিত্র ইসলামের পবিত্র প্রিয়নবীর জীবনী অধ্যয়ন করতে গিয়ে একথা মনে রাখতে হবে যে, তার জীবনে কারা বন্ধু ছিলেন আর কারা শত্রু ছিল, মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ও রসূলের শত্রু মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। আর আল্লাহ ও রসূলের বন্ধু মুসলমানের শত্রু হতে পারে না। নিজেদের জীবন গড়ার পথে জীবনে চলার পথে একথা রক্তমাংসসহ সমস্ত অনুভূতি দিয়েই স্মরণে রাখতে হবে। তাঁর জীবন থেকে আলো গ্রহণ করতে হবে। সেই আলোর ফুলকি দুনিয়ার দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই প্রিয়নবীর জীবনী পাঠের হক আদায় করা সম্ভব হবে। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এই প্রচেষ্টা।

সুতরাং নিজের জীবন দিয়ে আর জীবনের নির্যাস দিয়ে গড়ে তোলা এ পরিশ্রম সার্থক হলেই আমিও হবো সার্থক। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন সুম্মা আমীন।

২৩ জুলাই, ২০০০ — বিনীত
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ — মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অন্ধকার যুগের আরব	১১
তৎকালীন বিশ্বের অবস্থা	১২
জন্ম ও শৈশব	১৩
বোহায়রা সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ	১৫
হযরত খাদীজার সাথে বিবাহ	১৬
অদ্ভুত বোঝাপড়া	১৭
কাবা ঘর মেরামতী	১৮
নবুয়তপ্রাপ্তি	

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম প্রচার	২১
গোপনে ইসলাম প্রচার	২২
কুরাইশদের অত্যাচার	২৪
ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল	২৬

তৃতীয় অধ্যায়

হাবশায় হিজরত	৩১

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণ	৩৮
হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ	৩৯
সামাজিক বয়কট	৪১

পঞ্চম অধ্যায়

প্রিয়জন বিচ্ছেদ	৪৩
তায়েফে ইসলাম প্রচার	৪৬
আরো অন্যান্য স্থানে ইসলাম প্রচার	৪৭
সুওয়াইদ বিন সামিতের ইসলাম গ্রহণ	৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

মদীনায় ইসলাম	৪৯
ইয়াসরিবের ছয় পবিত্রাত্মা	৫১
আকাবার প্রথম বাইয়াত	৫২
আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত	৫৪

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

হিজরতের আদেশ ৫৪
মদীনায় ৫৬
মদীনায় পৌঁছানোর পর ৫৮

অষ্টম অধ্যায়

মদীনার নতুন অবস্থা ৬০
বদরের যুদ্ধ ৬১
কয়েদী ঃ যারা ধরা পড়েছিল ৬৫
বদর যুদ্ধের পরে ৬৬

নবম অধ্যায়

উহুদের যুদ্ধ ৬৯
যুদ্ধারম্ভ ৭১
উহুদ যুদ্ধের পরে ৭৪

দশম অধ্যায়

ইহুদিদের শয়তানী ৭৭
শত্রুদের চালবাজি ৭৮
আহজাবের যুদ্ধ ৮০
বনু কুরাইজার পরিণাম ৮৩

একাদশ অধ্যায়

হুদাইবিয়ার সন্ধি ৮৫
হযরত আবু জান্দালের প্রসঙ্গ ৮৮
প্রকাশ্য বিজয় ৮৯

দ্বাদশ অধ্যায়

খয়বরের যুদ্ধ ৯১
এ আলো ছড়িয়ে গেল সবখানে ৯৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সম্রাটদের উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণের পত্র প্রেরণ ৯৬
মক্কা বিজয় ৯৬
হুনাইনের যুদ্ধ ১০০
তাবুকের যুদ্ধ ১০২

চর্তুদশ অধ্যায়

আখেরী হজ্ব ১০৬
বিদায় হজ্জ ১০৭
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লামের অন্তিম
রোগাবস্থা ও ওফাত ১০৯

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

অন্ধকার যুগের আরব

আরবি ভাষায় যাকে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বলা হয়, বাংলায় তাকে বলা হয় 'অন্ধকার যুগ'। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব-পূর্ব আরবদেশকে অন্ধকার যুগের আরব বলে অভিহিত করা হয়। সে যুগের আরবের লোকেরা ছিল বাধাবন্ধনহীন এক উচ্ছৃঙ্খল ও অসভ্য জাতি। মূর্তিপূজার ন্যায় ঘৃণিত অপকর্ম ছিল তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেজন্য তাদের পৌত্তলিকও বলা হয়। তাদের মনগড়া দেবতার মূর্তি বানিয়ে তারা তার উপাসনা করত। এই পৌত্তলিকতা তাদের সমস্ত মানবীয় গুণাবলী ও সুকুমারবৃত্তিকে ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং সেই সাথে তাদের মধ্যে অদ্ভুত সব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। দুনিয়ার সমস্ত বস্তু— উপকারী-অপকারী সমস্ত বস্তুকেই তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। যেমন– পাথর, বৃক্ষ, চাঁদ, সূর্য, পাহাড়, সমুদ্র সমস্ত কিছুই ছিল তাদের আরাধ্য। আরবরা দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত ইত্যাদি অদৃশ্য বস্তুসহ তাদের পূর্বপুরুষদেরও মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। এমন কি, যে জ্বিন খালি চোখে দেখা যায় না, তারও কল্পিত মূর্তি বানিয়ে তারা তার উপাসনা করত।

এত অসংখ্য মূর্তি ও দেবদেবীর পূজা তারা করত বটে কিন্তু তারা তাদের আসল মাবুদ বা উপাস্য বলে মনে করত না। তাদের ধারণা ছিল যে, এসব দেবতা-অপদেবতা-মূর্তি-ফূর্তি এসব হচ্ছে আসল স্রষ্টার প্রতিনিধিস্বরূপ। এদের স্মরণ করলে এবং এদের কাছে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পেশ করলে বা এদের পূজো করলে তারা সন্তুষ্ট হয়ে মূল স্রষ্টার কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করলে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যাবে। তারা পরকাল বিশ্বাস করত, কিন্তু তাদের এই ধারণা ছিল যে, এসব মূর্তিদের খুশি করতে পারলে তাদের সুপারিশে আল্লাহ তাদের সমস্ত পাপরাশি মার্জনা করে দেবেন।

www.nagorikpathagar.org

অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত আরবদের এই ভ্রান্ত ও অন্ধবিশ্বাসের সাথে যোগ হয়েছিল পারস্পরিক কলহ ও অশান্তি। কথায় কথায় তাদের মধ্যে ঝগড়া লড়াই ও যুদ্ধবিগ্রহ বেধে যেতো। এবং কখনো কখনো তা বংশপরম্পরায় চলতে থাকতো। জুয়া খেলা ও মদ খাওয়া সাধারণভাবে এতটা প্রচলিত ছিল যে, সে যুগে দুনিয়ার আর কোনো জাতি এ বিষয়ে তাদের সমকক্ষ ছিল না। মদ ও তার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রশংসায় সে যুগের কবিরা যে কত কবিতা লিখে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ ছাড়াও সুদ ছিল আরেক জঘন্য অর্থনৈতিক প্রথা। লুটপাট, চুরি-ডাকাতি, অন্যায়-অনাচার, খুন-খারাবি, ব্যভিচার ইত্যাদি অপকর্মে সে সমাজ ছেয়ে গিয়েছিল। মানুষের আকৃতি-বিশিষ্ট এসব প্রাণীদের এসব আচরণ দেখে চেনার উপায় ছিল না যে, আদৌ এরা মানুষ না মনুষ্যাকৃতির কোনো জীব-জানোয়ার। তারা তাদের নিষ্পাপ শিশু-কন্যাদের অভিশাপ-জ্ঞানে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত। তাদের লজ্জাহীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতা নীতি-নৈতিকতার সর্বশেষ নিম্নতম পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। নারী-পুরুষেরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কাবাঘর পরিক্রমা করত এবং তারা মনে করত যে, এভাবে কাবাঘর পরিক্রমা করা খুবই পুণ্যের কাজ। নীতিনৈতিকতা, মনুষ্যত্ব, মানবতা, ধৈর্য, সহনশীলতা এসবের অবশিষ্ট আর তাদের মধ্যে ছিল না। এইভাবে তৎকালীন আরবজগৎ এক অন্ধকার গহ্বরে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

তৎকালীন বিশ্বের অবস্থা

শুধু ইসলাম-পূর্ব আরবদেশে কেন, তৎকালীন বিশ্বের সমস্ত দেশই ছিল সেই জঘন্য নোংরামি আর নীতিহীনতার শিকার। সে যুগে পারস্য ও রোম ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। রোমের অধিকাংশ মানুষ ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী কিন্তু তারা খ্রিস্টধর্মের মূল নীতি ও শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। এর ফলে, তাদের নীতি-নৈতিকতা ও স্বভাব-চরিত্রও অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল।

পারস্যের লোকেরা সূর্য ও নক্ষত্রাদির পূজা করত। তাছাড়া সে দেশের রাজা-বাদশাহ, দরবারী, আমীর-ওমরাহ প্রভৃতিরা সে দেশের মানুষের কাছে দেবতা বলে পূজিত হত। তাদের নৈতিক চরিত্রও মোটেই উন্নত ছিল না।

দেবদেবীদের সবচেয়ে বেশি রমরমা ছিল ভারতে। সে দেশে দেবতাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তেত্রিশ কোটিতে পৌঁছে গিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

জনসাধারণের মধ্যে নীতিনৈতিকতার অবশিষ্টটুকুও ছিল না। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপ্রথার কারণে মানুষকেই তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। সমাজের একদল লোক ঠাকুর ও পুরোহিত সেজে জনসাধারণের দেবতা ও ঈশ্বর হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র সমাজ এই নীতিহীনতার শিকার হয়ে পড়েছিল। মদ্যপান, জুয়া, নৃত্যগীত ইত্যাদি তাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

বাস্তবিকই সমগ্র দুনিয়ার অবস্থাই ছিল এই রকম। সারা বিশ্বের মানবজাতি ও মানবসমাজের যখন এই অবস্থা তখন তাকে শুধরে দিয়ে একটি সভ্য মানব সমাজ ও জাতি গঠনের জন্য একজন পয়গাম্বরকে প্রেরণ করা অতীব জরুরী হয়ে পড়েছিল। যিনি সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতিকে হেদায়েতের পথ দেখিয়ে দিতে পারেন।

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত দেশটির নাম আরব– একেবারেই পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি দেশ। যেন এই দেশ থেকেই সমগ্র পৃথিবীর দিগদিগন্তে সেই মহাসত্যের আহ্বান ছড়িয়ে পড়তে পারে। এরকমই একটি স্থানই হতে পারে সমগ্র বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শকের প্রকৃত কর্ম ও নর্ম্যভূমি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ জন্যই পয়গাম্বরে ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখানেই পাঠালেন এবং তাকে সমগ্র বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করলেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নবীদের পরম্পরায় সর্বশেষ সংস্কারক, নবী ও রসূল।

জন্ম ও শৈশব

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ, দাদার নাম ছিল আবদুল মুত্তালিব, যিনি হাশিম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাইয়ের পুত্র ছিলেন।

পিতা আবদুল্লাহর বিবাহ সম্পন্ন হয় জোহরা গোত্রে, ওয়াহাব বিন আব্দে মনাফের কন্যার সাথে, যাঁর নাম ছিল আমিনা।

তাঁর বংশ বিশ্বমানবেতিহাসে কুরাইশ বংশ নামে পরিচিত। এ ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একটি বংশ। যুগ যুগ ধরে ও বংশ পরম্পরায় এই বংশ ছিল কাবা ঘরের রক্ষক ও অভিভাবক– সে জন্য সে বংশ আলাদা একটি মর্যাদা

www.nagorikpathagar.org

ও মহিমা লাভ করেছিল। বরং বলা উচিত যে, যুগ পরম্পরায় মানুষের শ্রেষ্ঠতম গুণগুলি ঐ বংশে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। যার ফলে, সমগ্র আরবদেশে তাঁরা ছিলেন অতীব সম্মানিত।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল মুতাবিক ২৩ এপ্রিল সোমবার, মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রভাতের সূর্যোদয়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের কিছুকাল পূর্বে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন। দাদা আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে তিনি বেড়ে উঠতে থাকেন।

সবার আগে মাতা আমিনার কোলে, তারপর আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবার কোলে তিনি লালিত হন।

সে যুগে শহরের ধনী লোকেরা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ানো ও লালন-পালনের জন্য গ্রামাঞ্চলে দাইমাদের তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে দিতেন। যাতে সেখানকার খোলামেলা আবহাওয়া ও পরিবেশে তারা সুস্থ ও সবলভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং মাতৃভাষাও ভালো রকম রপ্ত করতে পারে। আরবে শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলের ভাষাকে আরো মধুর, স্পষ্ট এবং শুদ্ধ বলে গণ্য করা হত। এই রীতি অনুসারে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা শহরে এসে ধনী লোকেদের সন্তানদের নিয়ে আবারো গ্রামে চলে গিয়ে তাদের লালন পালন করে তাদের পরিবারে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেতো। সেইমতো, হাওয়াজিন গোত্রের কিছু মহিলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই মক্কায় আসে। তাদের মধ্যে হালীমা সাদিয়া নামেও এক মহিলা ছিলেন। বড়ই সৌভাগ্যবতী এ মহিলা কোনো শিশুকে না পেয়ে অবশেষে মা আমিনার এতিম শিশুকেই নিয়ে গেলেন।

তাঁর বয়স যখন চার বছর তখন মা আমিনা তাঁকে নিজের কাছে রেখে লালন পালন করতে লাগলেন। তাঁর যখন ছয় বছর বয়স, তখন মা আমিনাও তাঁকে রেখে জীবনের পরপারে পাড়ি দিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন আট বছর তখন দাদা আবদুল মুত্তালিব ইন্তিকাল করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব তাঁর পুত্র আবু তালিবের উপর অর্পণ করে যান। আবু তালিব তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে কোনো রকমের ত্রুটি করেন নি। আবু তালিব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচা ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

বোহায়রা সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারো বছর বয়সে তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়ায় যান। বসরায় সন্ন্যাসী বোহায়রা তাঁকে দেখে এবং তাঁর ভাব-লক্ষণ দেখে চিনতে পারেন। ইতিপূর্বে যেসব আসমানী গ্রন্থে শেষনবী প্রেরণের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সে অনুযায়ী তাঁর মধ্যেকার সমস্ত ভাব-লক্ষণ তার চোখে স্পষ্ট সত্য হয়ে দেখা দেয়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সাধু বুহেরা সেই নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন।

হযরত খাদীজার সাথে বিবাহ

হযরত মুহাম্মাদ (স) যখন যুবক হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর মনে বাণিজ্য করার আকাঙ্ক্ষা জাগল কিন্তু তাঁর পুঁজি ছিল না। মক্কায় খাদীজা নাম্নী বিদূষী এক বিধবা মহিলা ছিলেন। তাঁর অনেক সহায়-সম্পত্তি ছিল। তিনি তাঁর সম্পদ বাণিজ্যে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর গুণ-গরিমা, সততা, নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব, সামাজিক মান-মর্যাদা ও আমানতদারিতা সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁকে ব্যবসা দেখাশুনা করার জন্যে নিয়োগ করলেন। প্রিয়নবী (স)-কে নিয়োগ করার পর বিবি খাদীজার ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি হতে থাকল। প্রিয়নবী (স)-র সততা, তারুণ্য এবং বরকতপূর্ণ হাতের স্পর্শে ব্যবসায় সাফল্য আসাই ছিল স্বাভাবিক। প্রিয়নবী (স)-এর নির্মল চরিত্র ও সততা খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে খাদীজা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। মুহাম্মাদ (স) তখন ২৫ বছরে তরুণ। খাদীজা তাঁকে স্বামী হিসেবে লাভের বাসনা প্রকাশ করলেন। আরবের সেরা ধনী ও বীর পুরুষেরা যে খাদীজার পাণিপ্রার্থী হয়েও সফল হন নি সে খাদীজাই স্বেচ্ছায় মুহাম্মাদ (স)কে স্বামীত্বে বরণ করতে চাইলেন। তাই প্রিয়নবী (স)-এর পক্ষ থেকে সে প্রস্তাব সাদরেই গ্রহণ করা হল। দূরদর্শী মুহাম্মাদ (স) সত্য প্রচারের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিতকে মজবুত করার জন্যে খাদীজার প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিলেন। উভয় পরিবারের সম্মতিতে শুভ বিবাহের দিনক্ষণ ধার্য করা হলো। প্রিয়নবী (স)-এর চাচা ও অভিভাবক আবু তালিব এ বিয়ের খুৎবা পড়ালেন। এইভাবে বিবাহ সম্পন্ন হল। এ বিয়ের সময় খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

www.nagorikpathagar.org

অদ্ভুত বোঝাপড়া

ইসলাম-পূর্ব আরবদেশে দীর্ঘকাল ধরে একাধিক রক্তক্ষয়ী লড়াই চলে আসছিল। এই লড়াইগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী ও রক্তক্ষয়ী লড়াইটি ইতিহাসে ফিজার যুদ্ধ বলে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটি চল্লিশ বছর ধরে চলেছিল। কত মানুষ যে এ যুদ্ধে হতাহত হয়েছিল তার হিসেব নেই। এই বেদনাদায়ক ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটি তাঁর মধ্যেও গভীর দুঃখ ও বেদনার সঞ্চার করেছিল। তাই তিনি বড় বড় গোত্রের সরদার ও সমাজের বুদ্ধিমান লোকেদের কাছে গিয়ে দেশের অশান্তি, রাস্তার বিপদ, মুসাফিরদের সম্পদ হরণ, দুর্বলের উপর অত্যাচার এবং দেশে ক্রমবর্ধমান জুলুম অত্যাচার দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝালেন। সবশেষে এক সভা অনুষ্ঠিত হল। এতে বনু হাশিম ও আবদুল মুত্তালিব, বনু আসাদ, বনু জোহরা ও বনু তামীমরা অংশগ্রহণ করলেন। এই সভায় অংশগ্রহণকারীরা নিম্নবর্ণিত বিষয়ে শপথ গ্রহণ করলেন ঃ

১. আমরা দেশের অশান্তি দূর করব।
২. আমরা মুসাফিরদের রক্ষা করব।
৩. আমরা গরীবদের সাহায্য করব।
৪. আমরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার বন্ধ করব।
৫. কোনো অত্যাচারীকে আমরা মক্কায় থাকতে দেবো না।

তিনি নবী হওয়ার পরও এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন ঃ

'এই সমঝোতার বিনিময়ে আমাকে যদি লাল রঙের উটও দেওয়া হত, তা সত্ত্বেও তা থেকে আমি বিমুখ হতাম না। এবং আজও যদি এই সমঝোতার জন্য আমাকে কেউ ডাকে, তাহলে আমার জবাব হবে, আমি হাজির।'

এই সমঝোতার কল্যাণে মানুষের জীবন ও সহায়-সম্পদ চিরকালের জন্য সুরক্ষিত হয়ে গেল।

এই মহান কর্মের ফলস্বরূপ সে যুগের মানুষদের হৃদয়ে তিনি বড়ই সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তার প্রভাব এতটা গভীর ছিল যে, কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'আস্‌সাদিক' (চিরসত্যবাদী) ও 'আল-আমীন' (চির-আমানতদার) নামে অভিহিত করত।

www.nagorikpathagar.org

কাবা ঘর মেরামতী

কাবা ঘরের দেওয়াল সর্বপ্রথম পূণনির্মাণ করেছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তাঁর প্রিয়পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে। তারপর বনী জুরহাম, বনী আমালকা, কুসাই ও কুরাইশ তা মেরামত করেছিলেন। এবারও অতিরিক্ত বর্ষার কারণে কাবার দেওয়াল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। কাবাঘর মেরামতির জন্য কুরাইশরা আবার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। সমস্ত কুরাইশ গোত্র একত্রিত হয়ে কাবাঘর মেরামতির কাজ শুরু করে দিল। ইমারত নির্মাণকাজে তো সকলেই শামিল ছিলেন কিন্তু গোল বাধল 'হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) সংস্থাপন নিয়ে। এ কাজের গৌরব লাভ থেকে বঞ্চিত হতে কেউ রাজি ছিল না। সকলেই চাচ্ছিল এই সম্মানিত কাজের গৌরবলাভে গরবী হতে। এ সেই পাথর যেটি কাবাঘরের এক কোণে রাখা আছে। কাবা শরীফ তাওয়াফ বা পরিক্রমা করতে গেলে এখান থেকে যাত্রা শুরু করতে হয় এবং এখানে এসেই শেষ করতে হয।

কুরাইশদের এই ঝগড়া চারদিন পর্যন্ত জারি রইল। শেষ পর্যন্ত বাকি থাকল তলোয়ার নিয়ে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি শুরু করে দেওয়া। অবশেষে, পঞ্চম দিনের মাথায় আবু উমাইয়া বিন মুগীরা, যিনি কুরাইশকুলের একজন সম্মানিত ও প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি প্রস্তাব দিলেন কাউকে এ ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করা হোক, এবং তার রায়ই শিরোধার্য বলে মেনে নেওয়া হোক, এর ফলে, সব ল্যাঠা চুকে যাবে। অবশেষে, তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হল এবং সিদ্ধান্ত হল যে, আগামী দিন সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম হারাম শরীফে প্রবেশ করবেন তিনি হবেন এর ফায়সালাকারী।

আল্লাহর কি অসীম রহস্য যে, পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে যে ব্যক্তিকে এই পথে সর্বপ্রথম দেখা গেল তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখে সকলেই সমস্বরে বলে উঠল! 'ঐ দেখ, মুহাম্মাদ আল-আমীন আসছেন। তিনিই হবেন এই সমস্যার সমাধানকারী।' শেষ পর্যন্ত তিনি যে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাতেই সবাই খুশি হল। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক চাদর বিছালেন। তারপর নিজ হাতে পাথরটি তাতে রেখে সকল গোত্রপতিকে চাদরটি ধরে কাবা শরীফের সেই স্থানে নিয়ে যেতে বললেন,

www.nagorikpathagar.org

যেখানে পাথরটি রাখা হবে। যথারীতি তাই করা হল। এবার তিনি পাথরটি নিজহাতে সেই স্থানে রেখে দিলেন! কি সাংঘাতিক সমস্যা, অথচ কত সহজে তিনি সমাধান করলেন! তাঁর সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্তের ফলে, এক ভয়ানক গৃহযুদ্ধের কবল থেকে জাতি আরো একবার রক্ষা পেয়ে গেল। যেখানে সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে, ঘোড়া-গাধা-খচ্চরের পানি খাওয়ানো নিয়ে, ঘোড়-দৌড়ের ময়দানে, কবি-সম্মেলনে, একটি গোত্র যেখানে আরেক গোত্রকে ছাড়িয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হতে চাইত এবং সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে ভয়ানক লড়াই শুরু হয়ে যেতো, সেখানে এই সম্মানিত পাথর বসানো নিয়ে আরো কি সাংঘাতিক লড়াই যে, শুরু হয়ে যেতো, তা সহজেই অনুমেয়। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে, জাতি ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের কবল থেকে আরো একবার রক্ষা পেয়ে গেল।

নবুয়তপ্রাপ্তি

পয়গাম্বরে ইসলাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এক আলোকিত যুগের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তিনি সম্পূর্ণ নির্জনে নীরবে এক মহাসত্যের সন্ধানে অভিনিবিষ্ট হয়ে রইলেন। সেই সাথে এতসব অধঃপতন থেকে জাতিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার সঠিক পথের অনুসন্ধানে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, আমার জাতির লোকেরা কেন মূর্তিপূজায় ডুবে রয়েছে? তাদের এ অধঃপতন কিভাবে দূর করা যাবে? খোদায় পাওয়ার সত্য পথের সঠিক দিশা তাদের কিভাবে দেখাবো?

এসব নানাবিধ প্রশ্ন তাঁর চিন্তাচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রইল। এসব প্রশ্নের সঠিক জবাবের সন্ধানে তিনি ব্রতী হয়ে রইলেন।

মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়, যা গারে হেরা বা হেরা পাহাড় নামে পরিচিত। তিনি সেই পাহাড়ের গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েন। সাথে নিয়ে যান প্রয়োজনীয় পানাহার। সেখানে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এইভাবে চলতে থাকে দিন। পানাহার ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঘরে ফেরেন না।

একদিন তিনি হেরা গুহায় গভীর তন্ময়তার মধ্যে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স চল্লিশ। ৯ রবিউল আউয়াল, মোতাবেক ১২

www.nagorikpathagar.org

ফেব্রুয়ারি ৬১১ খ্রিস্টাব্দ। এমন সময় আল্লাহ তাঁর সামনে এক ফিরিশতা পাঠিয়ে দিলেন। ইনি আল্লাহর বাণীবাহক ফিরিশতা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম।

হযরত জিব্রাইল, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'পড়ুন!' তিনি বললেন ঃ 'আমি যে পড়তে পারি না!' একথা শুনে জিব্রাইল তাঁকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন, যেন তাঁর প্রাণপাখী উড়ে যেতে চাইল। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পড়ুন!' তিনি আবারো বললেন ঃ 'আমি পড়তে পারি না।' জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আবারো তাঁকে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন! 'পড়ুন!' তিনি পুনরায় বললেন ঃ আমি পড়তে জানি না।' জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এবার তৃতীয় বারের মতো বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক্ব। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক্ব। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আক্‌রাম আল্লাজী আল্লামা বিল ক্বা-লাম, আল্লামাল ইনসানা মা-লাম ইয়া'লাম।'

অর্থাৎ ঃ 'পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি একবিন্দু জমাট বাঁধা রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়, এবং তোমার প্রভু বড়ই সম্মানিত, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন এবং মানুষকে শিখিয়েছেন সেই জ্ঞান, যা সে জানত না।'

এ ছিল আল্লাহর তরফ হতে প্রেরিত প্রথম অহী। হযরত মুহাম্মাদ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনার পর ঘরে ফিরে এলেন। সে সময় তিনি খুব কাঁপছিলেন। তিনি হযরত খাদীজাকে বললেন ঃ 'আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও।' তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হল। যখন কিছুটা স্বস্তি পেলেন তখন তিনি হযরত খাদীজাকে পুরো বৃত্তান্ত শোনালেন এবং বললেন ঃ 'আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে।'

হযরত খাদীজা বললেন ঃ 'না। কখনোই না। আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনার কোন ভয় নেই। আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ করেন, দীন-দরিদ্রদের সাহায্য করেন, মুসাফিরদের সহযোগিতা করেন, আপনি সদাচারী।'

হযরত খাদীজা তাঁর ধারণাকে আরো পাকাপোক্ত করার মানসে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর চাচাতো ভাই অরাকা বিন

www.nagorikpathagar.org

নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি সেই অরাকা যিনি ছিলেন একজন জ্ঞানবৃদ্ধ ও ধার্মিক খ্রিস্টান। স্বধর্মের মধ্যেও ব্যাপক কুসংস্কার দেখে হতাশ হয়ে নতুন কোনো নবীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলেন। তওরাতের উপর তাঁর গভীর অধিকার ছিল।

হযরত খাদীজার অনুরোধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা অরাকাকে শোনালেন। অরাকা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন ঃ 'এ তো আল্লাহর বাণীবাহক ফিরিশতা। ইনি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হায়! আমি যদি যুবক হতাম! হায়, আমি যদি বেঁচে থাকতাম!! যে সময়ে আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশছাড়া করবে, তখন যদি আমার বয়স থাকত!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কি! আমার দেশবাসী আমাকে দেশছাড়া করবে?' অরাকা বললেন ঃ 'হাঁ, হাঁ। এ দুনিয়ায় যাঁরাই আল্লাহর বাণী নিয়ে মানুষের কাছে গেছেন, লোকেরা শুরুতেই তাঁদের সাথে শত্রুতা করেছে। হাঁ, যে সময়ে তারা আপনাকে দেশান্তরিত করবে, সে সময় যদি আমি জীবিত থাকতাম, তাহলে আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম!'

সে সময়ে অরাকা খুব বৃদ্ধ ও অশক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দৃষ্টিশক্তিও ছিল না। এ ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি পরপারে পাড়ি দেন।

এরপর হযরত জিব্রাইলের আগমন প্রায় ছ'মাস পর্যন্ত বন্ধ ছিল। তিনি অহীর পুনরাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তারপর জিব্রাইল আবারো আসতে লাগলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর মনে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় করে দিয়ে গেলেন যে, তাঁকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মনোনীত করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম প্রচার

হেরা গুহায় প্রথম অহী অবতরণের পর কিছুদিন যাবৎ অহী আসা বন্ধ ছিল। এরপর সূরা মুদ্দাসসির-এর কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

'ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাস্‌সির কুম ফা আঞ্জির ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির ওয়া সিয়া-বাকা ফা তাহ্‌হির ওয়াররু-জয ফাহজুর লা তামনুন তাস্তাক্‌সির ওয়া লিরাব্বিকা ফাসবির।' – মুদ্দাস্‌সির।

অর্থাৎ ঃ 'হে বস্ত্রাচ্ছাদনকারী! ওঠো (এবং লোকেদের ভ্রান্ত পথ থেকে) ভয় দেখাও এবং তোমার প্রভুর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করো, এবং বস্ত্র পবিত্র করো এবং পৌত্তলিকতা থেকে দূরে (সরিয়ে) রাখো, এবং বেশী অর্জনের উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দেবে না এবং তোমার প্রভুর উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ করো।'

নবুয়ত প্রদানের পর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে এই ছিল আল্লাহর প্রথম আদেশ। এবার আদেশ হল যে, ওঠো, মানবতার মুক্তির পথ প্রদর্শন করো এবং লোকেদের বিপথগামিতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির জন্য সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দাও অর্থাৎ এক আল্লাহর উপাসনার প্রতি তাদের আহ্বান করো। যারা এই পথ অনুসরণ করবে, ইহ-পরকালে তারা সফল হবে এবং পরকালে তাদের কুকর্মের শাস্তি স্বরূপ দুঃখজনক পরিণতির কথা তাদের জানিয়ে দাও।

নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণের পর সর্বপ্রথমে জনগণকে সব রকমের হাতে-গড়া মূর্তির উপাসনা ত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনায় মনোনিবেশ করার আদেশ অর্থাৎ ইসলামের আদেশ জারি করা হল। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম নিজের আত্মীয়স্বজনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন যারা ছিলেন তাঁর একান্ত আপনার জন, তিনি যাদের জ্ঞানীজন, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী ও সমঝদার বলে ধারণা করে এসেছিলেন। এসব লোকেরা নিজেদের মনগড়া ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এতটা অন্ধ ও কপট ছিলেন যে, তদের পক্ষে প্রিয়নবীর (সাঃ) এ আহ্বান খুব সহজে প্রত্যাখ্যান করাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

তাঁর এই কঠিন সময়ে তাঁর সুখদুঃখের প্রধান সাথী ছিলেন বিবি খাদীজা। তারপর হযরত আলী, হযরত জায়েদ ও হযরত আবুবকর

www.nagorikpathagar.org

রাজিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর চলার পথের পথিক, সাহায্যকারী ও বন্ধু। হযরত আলী (রাঃ) তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন, হযরত জায়েদ ছিলেন তাঁর মুক্ত করে দেওয়া দাস এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ছিলেন তাঁর বন্ধু ও সাহায্যকারী।

তিনি যখন এঁদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিলেন, তখন তাঁরা পরম বন্ধু, সহকারী এবং বিশ্বাসীর মতো তা সাদরে গ্রহণ করলেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী, মক্কায় তাঁর বিপনী কেন্দ্রও ছিল। লোকেদের সাথে তাঁর খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। জনসাধারণের উপর তাঁর অনেক প্রভাব ছিল। তাঁর ইসলাম প্রচারের ফলে হযরত উসমান (রাঃ), জুবাইর, আবদুর রহমান বিন আউফ, তালহা, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর হযরত আবু উবাইদা (রাঃ), আমীর বিন আবদুল্লাহ বিন জাররাহ (রাঃ) (পরে যিনি 'আমীনুল উম্মত' নামে খ্যাত হন), আবদুল আসাদ বিন হিলাল, উসমান বিন মাজউন, আমিরে বিন ফুহাইরা আজদী, আবু হুজাইফা বিন উৎবা, সাইব বিন উসমান এবং আরকাম পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেন।

মহিলাদের মধ্যে খাদীজা রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহা-উম্মুল মুমিনীন-এর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাসের পত্নী উম্মুল ফজল আসমা বিনতে আবুবকর ও উমর ফারুকের বোন ফাতিমা রাজিয়াল্লাহু আনহা পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেন।

গোপনে ইসলাম প্রচার

এতদিন যাবৎ গোপনে ইসলাম প্রচার হয়ে আসছিল। অতি সাবধানতার সাথে। কেবলমাত্র নিজেদের লোক ছাড়া কেউ তা জানত না। তারপর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ এসে গেল।

সেজন্য হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচারের ঘোষণা দিলেন।

একদিন তিনি মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন। সবার যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন।

'লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য এসেছি। এই আরব দেশে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কেউ নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

এসেছে বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ আমাকে তাঁর প্রতি তোমাদের আহ্বানের জন্য আদেশ দিয়েছেন। বলো, তোমাদের মধ্য থেকে কে আমার সহযোগী হবে?'

এ কথা শুনে সবাই চুপ করে রইল। এমন সময় দুঃখভারাক্রান্ত আঁখি ও হালকা-পাতলা-দুর্বল এক কিশোর দাঁড়িয়ে বলল ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সাথী হব।' তেরো বছর বয়সী এ হালকা-পাতলা-দুর্বল কিশোরের সাহস ও বীরত্ব দেখে সমগ্র কুরাইশকুল নিস্তব্ধ হয়ে রইল। ইনি আর কেউ নন; ইনি ছিলেন হযরত আলী। কি সাংঘাতিক তাঁর সাহস! কি জোরালো তাঁর ঘোষণা!

অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ী প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধর্মপ্রচারের জন্য বিভিন্ন মেলায়, জনসমাবেশে, অলিতে-গলিতে সর্বত্রই যেতে লাগলেন। গাছ, পাথর, সূর্য, চন্দ্র,সাগর, সমস্ত কিছুর পূজার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বুঝিয়ে আল্লাহর পথে সাধনায় ব্রতী হতে বললেন। কন্যা সন্তানদের জ্যান্ত কবর দেওয়া হতে বিরত রাখতে বলতে লাগলেন, ব্যভিচার করতে নিষেধ করতে লাগলেন এবং সুদ ও জুয়ার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন।

তিনি প্রচার করতে লাগলেন, অপবিত্রতা হতে নিজেদের রক্ষা করো। পরিধানের বস্ত্র পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখো। কুবাক্য বোলো না। মুখ ও হৃদয়কে অপবিত্র কথাবার্তা ও কু-ধারণা থেকে মুক্ত রাখো। সুন্দর আচরণ করো। অন্তরকে পাক-পবিত্র রাখো। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোরো না। ওজনে কম দিও না। ধোকাবাজি কোরো না। আল্লাহকে পাক-পবিত্র, দয়ালু, দাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও এক বলে জানবে। তাঁর কোনো শরীক কোরো না। মনে প্রাণে একথা বিশ্বাস রাখো যে, জমীন, আসমান, চন্দ্র, সূর্য ছোট-বড় সমস্ত কিছুরই স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। দোয়া কবুল করা, রোগ-যন্ত্রণা ও বালা-মুসিবতের কবল থেকে রক্ষা করা, অসুস্থকে স্বাস্থ্য দান করা, মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সমস্তই তাঁর ইচ্ছাধীন। আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছা ছাড়া জগতের কেউ কিছু করতে পারে না। ফিরিশতা ও নবীরাও তাঁর হুকুম ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করেন না।

আরবে ওকাজ, বুআইনা ও জিলমাজাজ নামে তিনটি বিখ্যাত মেলা বসত। দূর-দূরান্ত থেকে সে মেলায় লোক আসত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সব মেলায় যেতেন এবং জনসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন।

www.nagorikpathagar.org

কুরাইশদের অত্যাচার

সেই পরিস্থিতিতে আরব দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করা অত সহজ ব্যাপার ছিল না। কুরাইশ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকেরা সাংঘাতিকভাবে তার বিরোধিতা করতে লাগল। যার ফলে, ইসলামের প্রচার-প্রসার ব্যাহত হতে লাগল।

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফে প্রকাশ্যে তৌহিদের ঘোষণা করলেন। অভিশপ্ত- মুশরিক- পৌত্তলিকেরা এ আহ্বান শুনে দৌড়ে এসে ব্যাপক হাঙ্গামা শুরু করে দিল। চারিদিক থেকে এসে পৌত্তলিকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত হারিস বিন আবি হালা তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন কিন্তু পৌত্তলিকরা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাঁকে হত্যা করল। এইভাবে ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। আল্লাহর ফজলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপদ রইলেন এবং যে কোনো ভাবে হাঙ্গামা থেমে গেল।

এইভাবে তাঁর উপর জুলুম ও অত্যাচারের তুফান বইতে লাগল। শত্রুরা এইভাবে ইসলাম প্রচারে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। ইসলাম ও মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার জন্য তারা নিত্য-নতুন ফন্দী আঁটতে লাগল এবং ঈমান আনয়নকারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে দেওয়া হল। যাতে ইসলাম গ্রহণ থেকে লোকে বিরত থাকে এবং ইসলাম গ্রহণকারীরা ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় পৌত্তলিকতায় ফিরে আসে। যাঁদের উপরে এভাবে জঘন্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে হযরত বিলাল রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহুও ছিলেন, যিনি সে সময়ে উমাইয়া বিন খলফের ক্রীতদাস ছিলেন। উমাইয়া যখন শুনল যে, বিলাল ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন সে তার উপর নিত্য-নূতন অত্যাচার চালিয়ে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলল, যাতে তিনি ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় অভিশপ্ত পৌত্তলিক জীবনে ফিরে আসেন। তাঁর উপরে যে অমানুষিক নির্যাতনগুলো চালানো হয়েছিল, তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

* তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার দুষ্টু ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া হতো। আর তারা তাঁকে টেনে মক্কার পাহাড়ী রাস্তাগুলোতে ঘোরাতো।

* মক্কা উপত্যকার গরম বালুতে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে তার সারা দেহে ও বুকে বড় বড় পাথর চাপিয়ে দেওয়া হতো।

www.nagorikpathagar.org

* খুঁটিতে বেঁধে লাঠি দিয়ে পেটানো হতো।

* প্রচণ্ড রোদে ফেলে রাখা হতো।

হযরত বিলাল রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহুকে যখন এইভাবে কষ্ট দেওয়া হতো তখন তাঁর মুখ থেকে অনবরত একটাই শব্দ বেরিয়ে আসতো– 'আহাদ, আহাদ' (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক)। হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহু এ দৃশ্য দেখে আর সইতে না পেরে তাঁকে কিনে নিয়ে আল্লাহর নামে মুক্ত করে দিলেন।

হযরত আম্মার, তাঁর পিতা ইয়াসির ও তাঁর মাতা সুমাইয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুম মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আবু জেহেল তাদের উপরে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। সে আগুনের মতো তপ্ত বালুতে শুইয়ে তাদের এমনভাবে মারতো যে, তাঁরা বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের এই নির্যাতন দেখে বললেন ঃ

'ইসবিরু ইয়া আলা ইয়াসির ফা ইন্না-মাউ-ইয়িদু কুমুল জান্নাহ্।'

অর্থাৎ ঃ 'ইয়াসির পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধরো, তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।'

জঘন্য বদমাশ আবু জেহেল সুমাইয়াকে এত মার মারল যে, আঘাতে আঘাতে সুমাইয়া শহীদ হয়ে গেলেন। প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের উপর জুলুম-অত্যাচারের যে তুফান বয়ে চলেছিল, তা থেকে তিনি নিজেও রেহাই পাননি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চলার পথে বিষাক্ত কাঁটা বিছিয়ে রাখা হতো। তাঁর ঘরের দরজার সামনে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ফেলে দেওয়া হতো, যাতে দুর্গন্ধে টিকতে না পারেন। এত সব অত্যাচার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে সয়ে যেতেন এবং অবশেষে এতটুকুই বলতেন ঃ প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের এ কি আচরণ?'

আমর ইবনে আস রাজিয়াল্লাহু আনহু নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেছেন ঃ

একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফে নামাজ পড়ছিলেন। সে সময়ে উকবা বিন আবি মুয়িত এলো। সে তার চাদর পেঁচিয়ে দড়ির মতো করে নিল। যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাম সিজদায় গেলেন অমনি সেটি তাঁর গলায় পেঁচিয়ে দিয়ে কষে ফেলল। দমবন্ধ অবস্থায় তিনি সিজদায় পড়ে রইলেন। এমন সময় হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু সেখানে এসে পড়লেন। তিনি ধাক্কা মেরে উকবাকে হটিয়ে দিলেন। সে সময়ে তাঁর পবিত্র কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল পবিত্র কুরআনের এই বাণী ঃ 'তুমি কি এই ব্যক্তিকে এ জন্যই নির্যাতন করছ যে, তিনি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য বলে জ্ঞান করেন, এবং তোমাদের কাছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও পেশ করেছেন!'

কিছু লোক হযরত আবুবকরের উপর চড়াও হয়ে তাঁকে এমন মারধর করল যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

আর একদিনের ঘটনা। প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফে নামাজ পড়ছিলেন। কুরাইশরা সেখানে গিয়ে বসল। আবু জেহেল বলল ঃ 'অমুক জায়গায় একটি উট জবাই হয়েছে। যাও, কেউ গিয়ে তার নাড়িভুড়িগুলি এনে তার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর চাপিয়ে দাও।' এই ঘৃণিত অপকর্মটি করবার জন্য উকবা উঠে এলো এবং সেই অপবিত্র নাড়িভুঁড়ি আনল এবং সিজদারত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পিঠের উপর চাপিয়ে দিল।

কাফিরদের এই হৈহুল্লোড়ের আওয়াজ শুনে কন্যা ফাতিমা রাজিয়াল্লাহু আনহা সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর প্রিয়তম পিতার পিঠের উপর থেকে সেই অপবিত্র নাড়িভুড়িগুলি সরিয়ে দিলেন।

ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল

ইসলাম ও মুসলমানদের উপর পৌত্তলিক শত্রুদের এত সব জঘন্য অত্যাচার সত্ত্বেও ইসলামের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হল না; বরং উত্তরোত্তর বেড়ে চলল এবং দিনের পর দিন শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। এতসব বিরোধ সত্ত্বেও ইসলামের আওয়াজ দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এসব দেখে কুরাইশরা হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল। ইসলামের এ মহিমা ও অগ্রগতিকে রোধ করবার জন্য তারা নতুন চাল চালল। তারা চক্রান্ত করল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এমন সব অপপ্রচার চালাবে যে, লোকে তা শুনে যেন তাঁর ত্রিসীমানায় না ঘেঁষে। সমাজের কোনো লোক যেন তাঁর সাথে না মেশে এবং তাঁকে কোনো প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা না করে। তারা আশা

www.nagorikpathagar.org

করল যে, এর ফলে, ইসলামের শক্তি আপনা-আপনিই শেষ হয়ে যাবে। এতে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে পড়বে ও তারা নির্জীব হয়ে পড়বে এবং ইসলাম দুনিয়ার বুক থেকে চিরকালের জন্য মুছে যাবে।

সমগ্র আরব জানত যে, ইসলামের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপরে তাঁর চাচা আবু তালিবের হাত ছায়ার মতো বিরাজ করছে, যিনি মক্কার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। সর্বপ্রথমে তারা আবু তালিবকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করল, যাতে তিনি তাঁর উপরকার সমস্ত সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর উপর তারা এ ব্যাপারে বারবার চাপ সৃষ্টি করতে লাগল কিন্তু প্রত্যেকবারই তাদের এ জঘন্য প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

এবার রবীআর দুই পুত্র উত্‌বা ও শায়বা, আবু সুফিয়ান বিন হরব, আবু জেহেল, ওয়ালিদ বিন মুগীরাহ, হাজ্জাজ বিন আমিরের দুই পুত্র নাওয়িহ ও মুনাব্বাহ এবং আস বিন ওয়াইলের মতো গোত্রপতিরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিবের কাছে গিয়ে পৌঁছাল এবং বলল ঃ 'আবু তালিব! আপনার ভাইপো আমাদের দেবদেবীদের বিরুদ্ধে অনবরত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের বুজুর্গদের মূর্খ বলে অভিহিত করছেন এবং আমাদের বাপ-দাদাদের বিপথগামী বলে প্রচার করছেন। এমতাবস্থায়, হয় আপনি এসব অপপ্রচার থেকে তাঁকে বিরত রাখুন, নতুবা আমাদের এবং তার মাঝখান থেকে আপনি সরে যান। কেননা, আপনিও (নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায়গত দৃষ্টিতে) আমাদের মতো তাঁর ধর্মের বিরোধী। এবার আমরা তার মোকাবিলা করি।'

আবু তালিব তাঁদের সমস্ত কথা খুব ঠাণ্ডা মাথায় গভীর আন্তরিকতার সাথে শুনলেন এবং সব রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের বিদেয় করলেন। তারপর এই আপদেরা আবারো তাঁর কাছে এসে সেই আগের সুরে ন্যাকামি করতে শুরু করলঃ

'আবু তালিব! আপনি তো জানেন, বয়স, মান-সম্মান, ভদ্রতা ও উচ্চতায় আমাদের মধ্যে কোথায় আপনার স্থান। আমরা ইতিপূর্বে দাবি জানিয়েছিলাম যে, আপনি আপনার ভাইপোকে সামলান, কিন্তু আপনি আমাদের একটা কথাও রাখেননি। আল্লাহর কসম! তিনি যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের অপমান করছেন, আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের অপদার্থ

www.nagorikpathagar.org

সাব্যস্ত করছেন আর যেভাবে দেবদেবীদের উপর আমাদের বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন, তা আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া আর সম্ভব নয়। এখন যদি তাকে আপনি বিরত না রাখেন, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধেও যেমন, আপনার বিরুদ্ধেও তেমনি অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হবো। হয় আপনারা থাকবেন, না হয় আমরা থাকবো। যা হয় একটা হবে।'

আবু তালিব প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত কথা শোনালেন। তারপর, অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে বললেন ঃ 'পুত্র আমার! আমার উপর তুমি এতটা বোঝা চাপিও না যা বহন করা আমার সাধ্যের বাইরে চলে যায়।'

এক কঠিন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর এত বড় সহায় যিনি তাঁর এই দোদুল্যমান অবস্থা। কিন্তু ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা ভালোরকম জানতেন যে, ন্যায়ের এ কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার ক্ষমতা কারোরই নেই। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, কুরাইশদের সমস্ত প্রচেষ্টা একে একে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। তবুও বাতিল পথের পথিক সেই কুরাইশরা তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে আর তাঁর পরম সহায় চাচাকে উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে তাঁকে দুর্বল ও অসহায় করে দিতে চাচ্ছে। সেজন্য আবু তালিবের এ কণ্ঠস্বর শুনে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন ঃ

'চাচাজি! আল্লাহর কসম! এই লোকেরা যদি আমার ডান হাতে এনে দেয় আকাশের সূর্য, আর বাম হাতে এনে দেয় চাঁদ, তবুও আমি এ সত্য ধর্ম প্রচার থেকে বিরত হবো না। যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করবেন অথবা জিহাদের ময়দানে শহীদ করবেন– ততদিন পর্যন্ত এ প্রচার অব্যাহত থাকবে।'

আবু তালিব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দৃঢ় সংকল্প দেখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ভাবলেন, তাঁর এ দৃঢ়তার উৎস কোথায়? কোন্ শক্তির বলে তিনি সমগ্র আরব শক্তির বিপক্ষে এমন ইস্পাত কঠিন দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন?

আবু তালিব তাঁর ভাইপো-র এ দৃঢ় সংকল্প দেখে বললেন ঃ 'যাও পুত্র! তোমার যা-ইচ্ছা হয় তাই করো। তাতে আমার সমর্থন রইল। তুমি

www.nagorikpathagar.org

তোমার কাজ করে যাও। জগতের কোনো কিছুর বিনিময়েও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব না।'

কুরাইশরা এবার আর এক আপদ নিয়ে আবু তালিবের কাছে উপস্থিত হল। এবার তারা আর এক অদ্ভুত পরিকল্পনা নিয়ে এসে হাজির। আম্মারা বিন ওলীদ নামক এক মোটা-তাজা অপদার্থ যুবককে এনে আবু তালিবকে দেখিয়ে তারা বলল ঃ

'দেখুন আবু তালিব! এর নাম আম্মারা বিন ওলীদ। কুরাইশকুলের সবচেয়ে সুন্দর বুদ্ধিমান এক যুবক। তার দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা আপনার অনেক কাজে আসবে। আমাদের এই পুত্রকে আপনি নিন আর আপনার ভাইপো মুহাম্মাদকে আমাদের দিন। যে আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মের উপর আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আমরা তার দফা- রফা করে দিই। বিনিময়ে এই যুবকটিকে আপনি রাখুন।'

এ কথা শুনে আবু তালিব ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এবং ব্যঙ্গ করে বললেন ঃ 'বুদ্ধির ঢেঁকি কুরাইশ নেতৃবৃন্দ! তোমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। তোমাদের এই অপদার্থ পুত্রকে নিয়ে আমি খাইয়ে পরিয়ে মোটাতাজা করি আর আরবকুলের সূর্য আমার প্রাণপ্রিয় ভাইপোকে তোমাদের হাতে তুলে দিই আর তোমরা তার উপর মনের ঝাল মিটিয়ে নাও!'

তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বজ্রকঠিন স্বরে বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! তা কোনোদিন হতে দেবো না।' তারপর এ আপদ চলে গেল।

এ দিকে পৌত্তলিকতার অন্ধকার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে আরবের দুই নব যুবক হযরত হামজা ও হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা ইসলামের আলোয় স্নান করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। এ অবস্থা দেখে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক ব্যাপক দুর্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা অনুভব করল যে, এত চক্রান্ত ও বিরোধিতা সত্ত্বেও মুহম্মদের আহ্বান হাওয়ার বেগে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এবারে আরো কঠিন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

আবু তালিব বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আপদেরা এবার তারও সুযোগ নিতে চাইল। তবে এবার তারা সমঝোতার উদ্দেশ্যে

www.nagorikpathagar.org

এলো। তারপর আবু তালিবকে বলল ঃ 'যা কিছু ঘটে চলেছে, আপনি তা স্বচক্ষে দেখছেন। এবার আপনি আপনার ভাইপোকে ডাকুন। তার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিশ্রুতি আসুক, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা কেউ কারো ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করব না।'

প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকা হল। তিনি তাদের সমস্ত দাবি গভীর মনোযোগ সহকারে শোনার পর জবাব দিলেন ঃ 'কুরাইশ ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা শুধু আমার একটা কলেমা মেনে নিন। সমগ্র আরব আপনাদের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে।'

অনেক গভীর আশা নিয়ে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন। আশা করেছিলেন, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাঁর এই সামান্য কথাটুকু মেনে নেবেন আর এ আরব দেশে অন্ধকার ঘুঁচে গিয়ে এক আলোকিত যুগের সূচনা হবে।

আবু জেহেলের মতো জঘন্য বদমাইশ তা কিভাবে মেনে নিতে পারে? সে এক কড়া ধমক দিয়ে গাধার মতো চীৎকার করে বলে উঠল ঃ 'তোর বাপের কসম। একটা কেন, ওরকম দশটা কলেমা আমাদের জানা আছে।'

অন্য এক ব্যক্তি বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! এ লোকটি আমাদের একটা কথা কোনোদিন রাখেনি, আজো রাখবে না। চলো, এবার আমাদের পথ আমরা দেখি।' অবশেষে তারা নিরাশ হয়ে চলে গেল।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়
হাবশায় হিজরত

কুরাইশরা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোধ করার উদ্দেশ্যে সমস্ত রকমের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। একটা ব্যর্থ হয় তো আর একটা ধরে। এইভাবে অন্ধকারের যাত্রীরা আলোর পথের যাত্রীদের অন্ধকার জগতে বন্দী করে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ওরা জানে না যে, 'ফুঁ' দিয়ে এ বাতি কখনো নেভানো যাবে না।

তা সত্ত্বেও তাঁদের উপর একের পর এক অত্যাচারের বোঝা নেমে আসতে লাগল। মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়ে চলল। কিন্তু ইসলামের অমিয় সুধা যারা একবার পান করেছে, এবং যা তাদের রক্তমাংসের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, পৃথিবীতে কি এমন কোন শক্তি আছে যে, সেই বিশ্বাস থেকে তাদের টলিয়ে দিতে পারে?

দিনের পর দিন মুসলমানদের উপর অত্যাচারের এ সীমা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। মনুষ্যত্ব ও মানবতা এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইল। তবুও পশুআত্মাবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতির এ প্রাণীদের মনে এতটুকুও দয়ার সঞ্চার হল না। তাদের অন্ধকার হৃদয় ভেদ করে আলোর ঝিলিক দেখা দিল না।

মুসলমানদের উপর পৌত্তলিকদের এ অত্যাচার দেখে দেখে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন। তিনি তখনো পর্যন্ত অত্যাচারীদের কবল থেকে রক্ষার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখনো পর্যন্ত অত্যাচারিত মুসলমানরা শত অত্যাচার সয়েও ঈমানী শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে সমস্ত কিছুই মোকাবিলা করে চলেছিলেন।

প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো পর্যন্ত তাঁর সাথীদের আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছিলেন, আল্লাহ কোনো-না-কোনো পথের সন্ধান দিয়ে দেবেন। মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্যের আশায় দিন গুণে চলেছিলেন। এমতাবস্থায়, প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদের পরামর্শ দিলেন ঃ 'আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড়

www.nagorikpathagar.org

জায়গা। তোমরা এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহ অতি শীঘ্রই যে কোনো স্থানে তোমাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেবেন।'

জিজ্ঞাসা করা হল ঃ 'কোন্ দেশে যাওয়া যায়?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হাবশায় চলে যাও।'

নবুয়তের পঞ্চম বছরে, অনুমতি পাওয়ার পর ১২ পুরুষ ও মহিলার ছোট একটি শরণার্থী দল রাতের অন্ধকারে মক্কা ত্যাগ করে জেদ্দা বন্দরে গিয়ে জাহাজে আরোহণ করে হাবশা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল।

এই ক্ষুদ্র শরণার্থী দলের নেতা ছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহু। হযরত রুকাইয়া রাজিয়াল্লাহু আনহা (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা) তাঁর সাথে ছিলেন। প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হযরত সারা ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পরে এঁরা হলেন প্রথম জোড়া, যাঁরা আল্লাহর রাহে হিজরত করেছিলেন।'

এই শরণার্থী দলের মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার খবরে ক্ষুব্ধ কুরাইশরা তাদের ধাওয়া করার জন্য কয়েকটি লোক পাঠিয়ে দিল; কিন্তু তারা জেদ্দা বন্দরে গিয়ে শুনল যে, শরণার্থী দলের জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গিয়েছে।

এই মুহাজির বা শরণার্থী দলের হাবশায় পৌঁছানোর কিছুদিন পরে (রজব থেকে শাওয়াল মাসের মধ্যে) তাঁরা জানতে পারেন যে, কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে; তখন তারা ফিরে মক্কার সন্নিকটবর্তী স্থানে এসে জানতে পারেন যে, এ খবর সর্বৈব মিথ্যা; তখন তাঁরা পুনরায় হাবশায় ফিরে যান।

এর পরে ৮৫ পুরুষ ও ১৭ মহিলার সমন্বয়ে গড়া আরেকটি শরণার্থী দল হাবশায় গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। এই দলে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই হযরত জাফরও ছিলেন।

হাবশায় মুসলমানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দে বসবাসের খবরে কুরাইশরা মোটেও খুশি হল না। পৌত্তলিকরা মুসলমানদের সুখশান্তিতে কিভাবে খুশি থাকতে পারে, এটা কীভাবে সম্ভব? তাদের মধ্যেকার পশুপ্রবৃত্তি হায়েনার মতো ঘৃণিত হিংস্রতায় লকলক করে জেগে উঠল। কুরাইশরা পরামর্শ

www.nagorikpathagar.org

সভায় বসে সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে তাদের ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নিল। সেই মোতাবেক আবদুল্লাহ বিন রবীআ ও আমর বিন আসকে প্রতিনিধি রূপে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিল। নাজ্জাশীর দরবারীদের খুশি করে প্রভাবিত করবার জন্য ঘুষ স্বরূপ মূল্যবান উপঢৌকনাদিও পাঠিয়ে দিল।

হাবশায় পৌঁছে তারা দরবারী ও খ্রিস্টান পাদরিদের সাথে ষড়যন্ত্রের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তাদের সাথে বেশ সুসম্পর্কও গড়ে তুলল। ঘুষ স্বরূপ মূল্যবান উপঢৌকনাদিও তাদের দিল। এবার তারা তাদের বোঝাল, আমাদের শহরের কিছু ধর্মত্যাগী লোক, যারা তোমাদের ধর্মেরও শত্রু, তারা আমাদের সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। আমাদের শহর থেকে তাদের আমরা বের করেও দিয়েছি। তারা এখন তোমাদের এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে তাদের থাকতে দেওয়া ঠিক নয়। সে উদ্দেশ্যে তোমরা আমাদের সহযোগিতা কর।'

তাদের আসল লক্ষ্য ছিল যে, মূল ঘটনা যেন দরবারের লোকেরা জানতে না পারে। এক তরফাভাবে তাদের বক্তব্য শোনার পর বাদশাহ যেন মুহাজিরদের তাদের হাতে তুলে দেয়। এই আশায় তারা এসব গোপন ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল।

এসব লোকেরা দরবারী ও পাদরিদের ঘুষ-উপঢৌকন দিয়ে নিজেদের বশে এনেছিল। এবার তারা রাজদরবারে হাজির হয়ে নাজ্জাশীর সম্মানে উপঢৌকন পেশ করল এবং বলল ঃ 'মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে আপনার দরবারে এই বলে পাঠিয়েছেন যে, আমাদের ওখানকার কিছু লোক আপনার দেশে পালিয়ে এসেছে আমাদের সাথে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক।' সাথে সাথে ঘুষখোর দরবারি ও পাদরিরা হাঁ, হাঁ, করে উঠল এবং তাদের সাথে তাল মেলাল। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এক তরফা বক্তব্য শুনে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন ঃ 'আমার দেশে যারা আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্য না শুনে আমি তোমাদের হাতে তাদের সমর্পণ করতে পারি না।'

পরদিন দরবারে দু'পক্ষের লোক হাজির হলেন। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বাদশাহ আমাদের কাছে যা জানতে চাইবেন, তা সবিস্তারে বর্ণনা করব। খ্রিস্টান বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে

www.nagorikpathagar.org

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার কথাও তুলে ধরব। তারপর, তাঁর যা ইচ্ছা তিনি তাই করবেন।

নাজ্জাশীর দরবারে পৌঁছে দরবারের নিয়মানুসারে বাদশাহ্ নাজ্জশীকে তাঁরা আনত হয়ে সিজদা করলেন না।

দরবারিদের দৃষ্টিতে তা খুব খারাপ লাগল। তারা তাঁদের বলল ঃ 'দরবারের নিয়মানুসারে তোমরা বাদশাহকে সিজদা করলে না কেন?'

হযরত জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহু গভীর বিশ্বাসদৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ 'আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করি না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আমরা খুব সাদামাটা ভাবে সালাম করি।'

এবার মক্কার দূতেরা তাদের দাবি পেশ করতে গিয়ে বলল ঃ 'এই শরণার্থীরা ধর্মত্যাগী পলাতক অপরাধী। এরা একটা মনগড়া ধর্মের অনুসারী। এরা এই ধর্ম প্রচার করে সমাজে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। সেজন্য তাদের আমাদের সাথে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।'

নাজ্জাশী মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'খ্রিস্টধর্ম ও পৌত্তলিক ধর্মের বাইরে তোমরা কোন ধর্ম গ্রহণ করেছো যে, এদের সাথে তোমাদের বিরোধ উপস্থিত হয়েছে?'

হযরত জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের তরফ থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং বাদশাহ নাজ্জাশীর অনুমতি প্রার্থনা করে তাঁকে অনুরোধ করলেন যে, মক্কার দূতদের আর কিছু বলার আছে কি-না জিজ্ঞাসা করুন, তারপর তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন। অনুমতি পাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

'আমরা কি কারো ক্রীতদাস যে, মালিকের বিনা অনুমতিতে আমরা এদেশে পালিয়ে এসেছি? যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত?

আমর বিন আস বলল ঃ 'না। এরা কারো ক্রীতদাস নয়। মুক্ত ও স্বাধীন ভদ্রলোক।'

প্রশ্ন ঃ 'তাহলে আমরা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছি?'

www.nagorikpathagar.org

যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হোক।'

উত্তর ঃ 'না। এঁরা কোনো খুন-খারাবিও করেনি।'

প্রশ্ন ঃ 'আমরা কি কারো সম্পদ নিয়ে পালিয়ে এসেছি?' যদি তাই হয়, তবে, তা আদায় করতে প্রস্তুত।'

উত্তর ঃ 'না। এঁরা কারো ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেননি।'

এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের স্বভাব ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবার হযরত জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহু গভীর আন্তরিকতার সাথে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন ঃ

'মান্যবর সম্রাট! আমরা এককালে মূর্খতা ও বিপথগামিতার অন্ধকারে মানবেতর জীবন যাপন করছিলাম। এক আল্লাহর উপাসনা ত্যাগ করে আমরা শত শত মনগড়া দেবদেবীর চরণে আমাদের নিবেদন করে আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছিলাম। আমরা মৃত পশুপাখির মাংস খেতাম, ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম, লুটপাট, চুরিডাকাতি, জুলুম-অত্যাচার এসব ছিল আমাদের দৈনন্দিন বৈশিষ্ট্য। শক্তিমানরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করত, মানবতা ও মনুষ্যত্ব কেঁদে কেঁদে ফিরত। আমরা পশুদের চেয়েও অধম হয়ে পড়েছিলাম। এরপর আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করলেন। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তিনি রসূল মনোনীত করলেন। আমরা তাঁর বংশপরিচয় জানি। আমাদের মধ্যে তিনি সকলের চেয়ে ভদ্র, শ্রেষ্ঠ, মহৎ, সত্যবাদী, আমানতদার এবং পবিত্র। শত্রুমিত্র সকলেই তাঁকে পুণ্যাত্মা, শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বলে জ্ঞান করেন।

তিনি আমাদের ইসলামে আহ্বান করলেন। তিনি আমাদের মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনা করার আহ্বান জানালেন। তিনি আমাদের সত্যবাদী হতে বললেন। অন্যায় রক্তপাত ত্যাগ করতে বললেন। এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করলেন। প্রতিবেশীদের সাহায্য করার শিক্ষা দিলেন। ব্যভিচার ও অন্যান্য পাপকর্ম ত্যাগ করতে বললেন। অপবিত্র কথাবার্তা বলা থেকে বিরত হতে বললেন। তিনি আমাদের নামাজ পড়তে বললেন, রোজা করতে বললেন এবং সদাসর্বদাই আল্লাহর রাহে জীবন অতিবাহিত করতে বললেন। তিনি সম্পদের অপচয় করতে নিষেধ করলেন এবং দরিদ্র অসহায়দের সাহায্য করতে বললেন।

www.nagorikpathagar.org

আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি। তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমরা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছি,সমস্ত অপকর্ম থেকে তওবা করেছি– শুধু এই কারণে আমাদের সম্প্রদায় আমাদের সাথে শক্রতা করছে এবং আমাদের উপর অনবরত জুলুমও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে যাতে আমরা এই পবিত্র আলোকিত ধর্ম ত্যাগ করে আবার অন্ধকার জগতে ফিরে যাই।'

সত্য বাক্য যদি গভীর আন্তরিকতার সাথে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করা হয়, তাহলে তার প্রভাব মানুষের হৃদয়ের উপর পড়বেই। নাজ্জাশীর মতো ধার্মিক বাদশাহর হৃদয় এ মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনে মোমের মতো গলে গেল। তিনি বললেন ঃ 'আচ্ছা, তোমাদের নবীর উপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে গ্রন্থ থেকে আমাকে কিছু শোনাতে পারবে?'

অতঃপর হযরত জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনের 'সূরা মরিয়ম' হতে কিছু আয়াত পাঠ করলেন। তা শুনে নাজ্জাশী ভাবপ্রবণ হয়ে পড়লেন। তাঁর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, তাতে তাঁর গণ্ডদেশ ভিজে গেল। তিনি ভাববিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ 'আল্লাহর কসম! এই পবিত্র বাণী ও ইঞ্জিল তো একই প্রদীপের আলো।' তারপর তিনি বললেন ঃ 'মুহাম্মাদ তো সেই রসূল, যাঁর আগমনের সুসংবাদ ঈসা-মসীহ্ দিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, আমার ভাগ্যে তিনি সেই নবীর জমানা লিখে রেখেছেন।'

সাথে সাথে তিনি জানিয়ে দিলেন, মুহাজিরদের ফেরৎ পাঠানো হবে না। কুরাইশ প্রতিনিধিদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হল। ফলে, নিরাশার কালো মেঘ ছেয়ে গেল তাদের উপর।

পরদিন কুরাইশরা আর এক চাল চালল। তারা দরবারে গিয়ে নিবেদন করল ঃ 'এই মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করুন, হযরত ঈসা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস কি?' এরা জানত যে, এদের বিশ্বাস খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের পরিপন্থী। তারা তো বলে, ঈসা আল্লাহর পুত্র কিন্তু মুসলমানরা বলে, ঈসা আল্লাহর বান্দা ও নবী। এ ঘটনা নাজ্জাশী জানতে পারলে তিনি অবশ্যই মুসলমানদের উপর ক্ষুব্ধ হবেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে।

নাজ্জাশী পুনরায় মুসলমানদের দরবারে ডেকে পাঠালেন। যখন তাদের আবার ডাকা হল, তখন তাঁরা এই ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, না

www.nagorikpathagar.org

জানি তা নাজ্জাশীর উপর কি প্রভাব ফেলে! কিন্তু হযরত জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ 'কথা যাই হোক না কেন, আমাদের সত্য বিশ্বাসটিই তাঁর সামনে পেশ করা উচিত।'

তারপর হযরত জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহু দরবারে উদাত্ত কণ্ঠে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ঘোষণা করলেনঃ 'আমাদের পয়গাম্বর বলেছেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও বাণীবাহক দূত এবং 'কালিমাতুল্লাহ্'।

একথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি শুকনো ঘাস হাতে তুলে নিয়ে বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! তুমি যা বলেছো,হযরত ঈসা এর চেয়ে বেশি কিছু ছিলেন না।'

পাদরিরা ঘুষ স্বরূপ যে উপঢৌকনগুলি পেয়েছিলেন তা এখন তাদের কাছে বোঝা মনে হতে লাগল। নাজ্জাশী কোনো কিছুর পরোয়া না করে স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিলেন, তাদের সমস্ত উপঢৌকন ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

এর ফলে, কুরাইশদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অবশেষে তারা বিফল মনোরথ হয়ে মক্কায় ফিরে গেল।

নাজ্জাশী হযরত জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহু সহ তাঁর সমস্ত সাথীদের মর্যাদার সাথে তাঁর দেশে বসবাস করার অনুমতি প্রদান করলেন এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামের নবুয়ত স্বীকার করে নিয়ে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করলেন। যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবানা পদ্ধতিতে তাঁর নামাযে জানাজা পড়েন। পর্যায়ক্রমে ৮৩ মুসলমান হাবশায় হিজরত করেন।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণ

মক্কায় একদিকে মুসলমানদের উপর কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচারের স্টিম রোলার অব্যাহতভাবে চালু ছিল অন্যদিকে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীরা ধৈর্যের পাহাড়ের মতো তা নীরবে সয়ে চলেছিলেন; আবার অন্যদিকে আরো অগণিত মানুষ সেই অত্যাচারিত মানুষদের কাফেলায় এসে যোগ দিয়ে তাঁদের দলকে ভারি করে তুলছিলেন।

নবুয়তের ষষ্ঠ বছরের একটি ঘটনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে বসে ছিলেন। আবু জেহেল সেখানে গিয়ে হাজির হল। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিল। তিনি তা শুনে নীরব রইলেন। এবার সে একটি পাথর নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় আঘাত করল। তাতে তাঁর মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ বিন জাদওয়ালের দাসী তা দেখে ফেলে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হামজা শিকার করতে গিয়েছিলেন। তীর-ধনুক কাঁধে নিয়ে তিনি ফিরে এলে সেই দাসী সমস্ত ঘটনা তাঁকে শোনাল। বলল ঃ 'হায়! তোমার ভাইপো-র উপরে কি অত্যাচার করা হয়েছে, তুমি শুনলে কি তা সইতে পারবে?'

একথা শুনে হামজা-র অন্তর দরদে পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি সোজা কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে আবু জেহেল বসে ছিল। তিনি আবু জেহেলের মাথায় প্রচণ্ড জোরে ধনুকের আঘাত দিয়ে বললেন ঃ 'কেন তুই মুহাম্মাদকে গালি দিয়েছিস? যদি তাই হয়,তাহলে আজই আমি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলাম। তিনি যা কিছু বলেন, আমিও তাই বলছি। যদি সাহস থাকে, তবে মোকাবিলা করতে আয়।'

আবু জেহেলের সাহায্যের জন্য বনী মখজুম গোত্রের এক ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে দাঁড়াল, আবু জেহেল তাকে নিবৃত্ত করল, বলল ঃ 'বাদ দাও। সত্যিই আমি আবু আম্মারাকে খুব খারাপ ভাষায় গালি দিয়েছি।'

তারপর হামজা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন ঃ 'ভাইপো! তুমি একথা শুনে খুশি হবে যে, আমি তোমার উপর আবু জেহেলের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছি।'

www.nagorikpathagar.org

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'চাচাজি! একথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি মুসলমান হয়ে যাও, আমি আরো খুশি হবো।'

হামজা বড়ই আবেগমথিত কণ্ঠে আবু জেহেলের সাথে যা কিছু ঘটেছিল, তার সবকিছু বর্ণনা করলেন। তিনি বাতিল ত্যাগ করে হকের অধীনে এলেন; যা একান্তই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ধর্ম। হকের জয় হল। হযরত হামজা রাজিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম-বিরোধী অত্যাচারীদের অন্যতম ছিলেন উমর। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুয়ত লাভ করেন তখন উমর ছিলেন সাতাশ বছরের যুবক। সে সময় ইসলাম তাঁর পরিজনদের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। তাঁর ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেন; তাঁর প্রভাবে উমরের বোন ফাতিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বংশের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি নঈম বিন আবদুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। উমর প্রথমে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা কিছুই জানতেন না। পরে জানতে পেরেই তিনি তাঁদের শত্রুতে পরিণত হন।

লবীনা ছিলেন তাঁর বংশেরই এক ক্রীতদাসী। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে উমর তাঁকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলতেন, তারপর জ্ঞান ফিরলে তাঁর উপর আবারও অত্যাচার চালাতে শুরু করতেন।

অবশেষে উমর একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সবকিছুর মূলেই রয়েছেন যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁকেই তিনি একেবারে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্ধানে তাঁকে নিধন করার জন্য। পথেই দেখা হল নঈম বিন আবদুল্লাহর সাথে। তিনি বললেন, আগে তুমি ঘরের খবর নাও, পরে অন্যের খবর নিও।

শোনামাত্রই উমর পথ পরিবর্তন করে তাঁর বোনের গৃহের দরজায় গিয়ে ঘা দিলেন। তখন তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ করছিলেন! উমরের কণ্ঠস্বর শোনামাত্রই তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন এবং কুরআনের পাতাগুলো লুকিয়ে ফেললেন।

www.nagorikpathagar.org

উমর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কি পাঠ করা হচ্ছিল?' বোন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। উমর বললেন ঃ 'আমি জানি, তোমরা পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছো।' এ কথা বলেই তিনি ভগ্নীপতি সাঈদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখতে না পেরে তাঁর বোন তার স্বামীকে বাঁচাতে এলে উমর এবার সাঈদকে ছেড়ে বোন ফাতিমাকে সাংঘাতিকভাবে প্রহার করলেন। যার ফলে, তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সুদৃঢ় পদভরে তিনি তাঁর ঈমান আনার কথা ঘোষণা করে বললেন ঃ 'উমর! তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারো, কিন্তু জেনে রেখো মরে গেলেও আমরা ইসলাম ত্যাগ করব না।'

উমর তাঁর বোনের গভীর বিশ্বাসতপ্ত এ দৃঢ় উচ্চারণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তা তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। সাথে সাথে তাঁর হৃদয় কোমল হয়ে এলো। অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন ঃ 'তোমরা এতক্ষণ কী পড়ছিলে, আমাকে একটু শোনাও!' তিনি পবিত্র কুরআনের সেই পত্রগুলি বের করে এনে আবেগ মথিত কণ্ঠে পড়তে লাগলেন। তা ছিল 'সূরা ত্বাহা'। তিনি পড়তে পড়তে যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছালেন– 'আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। তোমরা আমারই উপাসনা করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম করো।'

তখন তা তাঁর উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে বলে উঠলেন ঃ 'আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।' অর্থাৎ ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল।'

এবং সোজা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্ধানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সে সময়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আরকামের গৃহে অবস্থান করছিলেন। উমর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন। যেহেতু তাঁর হাতে তলোয়ার ছিল সেহেতু সাহাবিরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু হযরত হামজা রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ 'আসতে দাও, উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে ভালো, নইলে তার মোকাবিলা করা শুধু আমার বাম হাতের কাজ।'

ভিতরে প্রবেশ করতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে বললেন ঃ 'কি উমর? কি মনে করে?'

www.nagorikpathagar.org

একথা হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর ছায়ার মতো প্রভাব বিস্তার করল। উমর অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন ঃ 'ঈমান আনার জন্য।'

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে উদাত্ত কণ্ঠে আওয়াজ তুললেন ঃ 'আল্লাহু আকবর।' সাথে সাথে তাঁর সাথীরাও কণ্ঠ মেলালেন। সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ করে সে বুলন্দ্ আওয়াজ আরব উপদ্বীপের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত ইসলাম গোপনে প্রচারিত হয়ে এসেছিল, মুসলমানদের তখনো পর্যন্ত কাবা শরীফে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়ার সাহস ছিল না। হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পর সমস্ত অবস্থা বদলে গেল। তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। ফলে, অনেক হাঙ্গামা হল; কিন্তু এবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আরো কঠিন হয়ে পড়ল। মুসলমানরা এবার প্রকাশ্যে কাবা শরীফে এসে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতে লাগলেন।

সামাজিক বয়কট

হযরত হামজা ও হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতো বিখ্যাত বীর-যুবকদের ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ খুব ভালোভাবে বুঝে নিলেন যে, ইসলামের শক্তি দিনের পর দিন অপ্রতিহত হয়ে পড়ছে। তাদের এই অগ্রগতি রোধ করবার জন্য তারা গোল হয়ে বসে মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করতে লাগল এবার কী করা যায়?

নবুয়তের সপ্তম বর্ষের মুহররমুল হারাম মাসে মক্কার সমস্ত গোত্র একত্রিত হয়ে এক সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষর করল এই মর্মে যে, বনু হাশিম গোত্রকে সর্বপ্রকারে বয়কট করা হবে। তাদের সাথে সামাজিক মেলামেশা, লেনদেন, বিয়ে-সাদী, খাওয়া-দাওয়া, বেচাকেনা সমস্ত কিছুই তাদের সাথে ততদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার জন্য আমাদের হাতে অর্পণ না করবে।'

এই সমঝোতা-চুক্তি লিখে কাবার দরজায় লটকে দেওয়া হল।

আবু তালিবের সাথে বহুবার আলাপালোচনা শেষে তারা যখন বুঝল যে, আবু তালিব রসূলুল্লাহকে তাঁর দায়িত্ব থেকে বিরত করবেন না এবং বনু হাশিম গোত্র মুহম্মদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না– তখন তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

www.nagorikpathagar.org

এবার বনু হাশিমের সামনে দুটি পথ খোলা থাকল। হয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেরদের হাতে তুলে দেওয়া, নতুবা বয়কটের কারণে তাঁদের উপর মুসিবতের যে বোঝা চাপবে তা নীরবে সহ্য করে নেওয়া।

অবশেষে, আবু তালিব নিরুপায় হয়ে তাঁর বংশের লোকেদের নিয়ে দুই পাহাড়ের এক সংকীর্ণ জায়গায় গিয়ে নজরবন্দী হয়ে গেলেন। বনু হাশিমের বংশের সাথে সম্পর্কিত লোকেরাও তার অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন।

এই পাহাড়ি উপত্যকায় এ সব লোকেরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বড় কষ্টের মধ্য দিয়ে তিনটি বছর কাটিয়ে দিলেন। এ অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট দেখেও বড় পাষাণেরও হৃদয় গলে যাওয়ার কথা। গাছের ছাল ও পাতা খেয়ে এবং শুকনো চামড়া পর্যন্ত তাঁদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্যতালিকা থেকে বাদ গেল না। অবস্থা এমন হল যে, বনু হাশিমের দুধের শিশুদের ক্ষুধার জ্বালায় কাৎরানির আওয়াজ দূর-দূরান্ত হতেও শোনা যেতে লাগল। এ আওয়াজ শুনে কুরাইশরা আনন্দে-আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ত।

এই ভয়ংকর বন্দীদশা দেখে একবার হাকিম বিন হিজাম (হযরত খাদীজার ভাইপো) কিছু ক্রীতদাস মারফৎ গোপনে কিছু খাদ্য পাঠালে পাপিষ্ট আবু জেহেল তা কেড়ে নিল। ঘটনাক্রমে আবুল বখতারীও এসে গেল। তার মধ্যে কিছু মনুষ্যত্ব ছিল। সে আবু জেহেলকে বলল, ছেড়ে দাও তো তাকে। সে তার ফুফীর খাওয়ার জন্য কিছু পাঠাচ্ছে, তাও তুমি কেড়ে নিচ্ছ?

এইভাবে, হিশাম বিন আমরও লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু খাদ্যসামগ্রী পাঠাতেন।

এইভাবে এই ভয়ঙ্কর বয়কটের মধ্য দিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের লোকদের তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এর বাইরের মুসলমানরা তাঁদের বাড়িতে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করলেন।

আল্লাহর মেহেরবানিতে অবস্থা এমন হল যে, শত্রুরা নিজেরাই এই চুক্তিপত্র ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বয়কট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

প্রিয়জন বিচ্ছেদ

বয়কট ও নজরবন্দীর পালা শেষ হল। কিন্তু একথা ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে, তার ফলে সমস্ত মুসিবত দূর হয়ে গেছে; বরং তার চেয়েও কঠিন পরিস্থিতি সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। কঠিন হতেও কঠিনতর পরিস্থিতি।

এ নবুয়তের দশম বর্ষের কথা।

এ বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আবু তালিবের প্রয়াণ। এইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রকাশ্য সহযোগী তাঁর জীবন থেকে চলে গেলেন। যিনি পৌত্তলিক শত্রুদের কবল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করে এসেছিলেন।

এ বছরের দ্বিতীয় ঘটনা হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনসঙ্গিনী ও বড় সহায় হযরত খাদীজা রাজিয়াল্লাহ আনহার মহাপ্রয়াণ। তিনি তো শুধু তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সবার আগে ঈমান আনয়নকারিণী মহিমান্বিত নারী। তিনি ঈমান আনয়নের সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রকারে সহায়তা দিয়ে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হওয়ার হক আদায় করে গিয়েছিলেন। নিজের সমস্ত সহায়-সম্পদ সর্বপ্রকারের সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে তিনি তাঁর মহৎ জীবনকে ব্যয় করে গেলেন। যে কথা ইতিহাসে চিরকাল সোনার হরফে লেখা থাকবে। তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে ঃ

'ওয়া কানাত লাহু ওয়াজিরা।'

(তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উজীর স্বরূপ ছিলেন)।

একের পর এক দুই সাহায্যকারীর প্রয়াণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ই মর্মাহত হয়ে পড়লেন। যারা ছিলেন তাঁর একান্ত সহযোগী ও বন্ধু। তাদের প্রয়াণে তাঁর মধ্যে শোক ও বেদনার তুফান উঠল। তাঁর মনের আকাশ হতাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সম্ভবত, আল্লাহতা'লা এটাই চাচ্ছিলেন যে, সত্যের আলো অন্ধকারের মধ্য থেকে

www.nagorikpathagar.org

নিজের পথ ধরে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। প্রমাণ হোক যে, সত্য সত্যই; তার হেফাজত সে নিজেই করতে সক্ষম।

এবার কুরাইশরা নতুন পদ্ধতিতে তাঁর উপর জুলুম-অত্যাচার শুরু করল। দুষ্ট মহিলাদের তাঁর পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হল উত্যক্ত করার জন্য। তাঁকে দেখে তারা হইচই করতে লাগল। নামাজে গেলে হাততালি দিতে লাগল। পথ চলার সময় তাঁর উপর দুর্গন্ধ ময়লা ফেলে দেওয়া হতে লাগল। তাঁর চলার পথে বিষাক্ত কাঁটা বিছিয়ে দিতে লাগল। এইভাবে তারা দিনের পর দিন তাদের জুলুমের হাত প্রসারিত করে চলল। অকথ্য ও অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগল।

একবার আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা পাথর হাতে নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে কাবা শরীফ পর্যন্ত এলো; তার ইচ্ছা ছিল এই পাথরের আঘাতে সে তাঁকে হত্যা করবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কাবা শরীফেই ছিলেন কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার দৃষ্টির আড়ালেই তাঁকে রক্ষা করলেন। এমন সময় হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু সেখানে পৌছালে সে পাপিষ্ঠা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

এই রকমই আবু জেহেল একবার পাথর উঠিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিঃশেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌছে যায় কিন্তু আল্লাহ আবু জেহেলকে এমন গজবের আযাব দেখিয়ে দিলেন যে, সে কিছুই করতে সক্ষম হল না।

একবার তো শত্রুরা তাঁকে হত্যার জন্য তাঁর উপর সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঘটনা ছিল একরম। কিছু শত্রু প্রিয়নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে বলাবলি করছিল যে, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা এতদিন পর্যন্ত যা বরদাশ্‌ত করেছি, তার কোনো তুলনা নেই। ইতিমধ্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এসে পড়লেন। সেই লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ 'আপনি কি এই সব কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছেন?' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ সাহসিকতার সাথে দৃঢ়পদভরে বললেন ঃ'হাঁ, আমি এসব কথা প্রচার করছি।' একথা বলা শেষ হতে না হতেই শত্রুরা চারিদিক থেকে তাঁর উপর হামলা চালিয়ে দিল।

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বর্ণনা করেছেন, 'কুরাইশদের পক্ষ থেকে এত বড় জুলুম ইতিপূর্বে আমি আর কখনো দেখিনি।'

www.nagorikpathagar.org

হামলা শেষ হল। তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের স্পষ্ট ভাষায় হুশিয়ার করে দিয়ে বললেন ঃ 'আমি তোমাদের সামনে আল্লাহর এই বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আর তোমরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছো।' অর্থাৎ, অত্যাচারের যে আঘাত তোমরা আমার উপর চালিয়ে যাচ্ছো, এই মহাকাল সাক্ষী, আল্লাহর এটাই বিধান যে, এই আঘাত তোমাদের উপর বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে। তোমাদের এই অত্যাচার, শক্তি ও সাহস সেদিন পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। সেই দিন অতি শীঘ্রই এগিয়ে আসছে।

হযরত উসমান বিন আফফান রাজিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যক্ষ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। উকবা বিন আবু মুঈত, আবু জেহেল ও উমাইয়া বিন খলফ হাতিম-এ বসে ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করতেই তারা নোংরা ভাষায় জোরে জোরে কলেমা নকল করতে লাগল। পর পর তিনবার এরকম হল। শেষবারের মাথায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার রঙ বদলে গেল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! তোমরা যদি এ থেকে বিরত না হও, তাহলে তোমাদের উপর অতি শীঘ্রই আল্লাহর গজব এসে যাবে।'

হযরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাঁর এই কথার মধ্যে যে প্রতাপ সেদিন আগুনের মতো বেরিয়ে এসেছিল, তা দেখে তারা থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। একথা বলার পর প্রিয়নবী বাড়ির পথে রওনা হলে উসমান ও অন্য এক ব্যক্তি তাঁর সাথী হলেন। চলতে চলতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

'তোমাদের জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দ্বীনকে বিজয় করবেন, তাঁর কলেমাকে ছড়িয়ে দেবেন এবং তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করবেন। আর এই যে সব লোকদের তোমরা দেখলে, আল্লাহ তা'লা অতি সত্বরেই তোমাদের হাত দিয়ে তাদের নিধন করাবেন।'

এ এক অসাধারণ ও অদ্ভুত অলৌকিক উক্তি। তাঁর এ উক্তি অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। আর এ আন্দোলন অতি-সত্বরেই সাফল্য লাভ করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

তায়েফে ইসলাম প্রচার

তায়েফ ছিল পত্রপুষ্পে পরিপূর্ণ অতি সুন্দর ও উর্বর একটি উপত্যকা। পর্যাপ্ত পানি, ছায়া, ক্ষেতভর্তি ফসল, বাগ-বাগিচা, সুন্দর আবহাওয়া তায়েফকে একটি আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করেছিল। এখানকার লোকেরা ছিল অবস্থাপন্ন। অভাব-কষ্ট না থাকায় তারা পুরোমাত্রায় দুনিয়াদারিতে ডুবে গিয়ে বিলাসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তারা তাদের স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে নীতিনৈতিকতাহীন, ভ্রষ্ট চরিত্রের এক অধঃপতিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। গোষ্ঠীপ্রিয়তা ও নৈতিক অধঃপতন ছিল মক্কাবাসীদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তায়েফবাসীরা ছিল বিলাসী ও সুদখোর। নৈতিক দিক দিয়ে এ দুটিই ছিল ঘোর অধঃপতনের নামান্তর। ফলে, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও মানবতার অনেক ঘাটতি ছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফে গিয়ে সর্বপ্রথম বনী সকীফ গোত্রের প্রধানদের সাথে সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এরা ছিল তিন ভাই– আব্দে লাইল,মাসউদ ও হাবীব। এদের মধ্যে একজনের স্ত্রী ছিল এক কুরাইশ-কন্যা (বনী জুমহা)। এই সূত্রে কুরাইশদের সাথে তাদের আত্মীয়তা ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে গিয়ে বসলেন এবং অত্যন্ত মনমনোহর ভাষায় তাদের ইসলামের পয়গাম শোনালেন এবং হক প্রচারের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করলেন।

এর জবাবে প্রথম ব্যক্তি বলল ঃ 'আল্লাহ যদি তোমাকে সত্যিই রসূল মনোনীত করে থাকেন, তাহলে তার কি প্রমাণ সাথে করে এনেছো?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল ঃ 'আরে! আল্লাহ তোমাকে ছাড়া রসূল মনোনীত করার আর কোনো লোক পাননি?'

তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! তোমার কথা শুনতে আমি একেবারেই রাজি নই। তুমি যদি তোমার কথা অনুসারে আল্লাহর রসূল হয়ে থাকো, তাহলে তোমার সাথে এ বিষয়ে কথা বলা আদপের খেলাপ। আর তুমি যদি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে রসূল বনতে চাও, তাহলে তো তোমার সাথে কথাই বলা যাবে না।'

এ ছিল বিষ মাখানো তীরের ফলার আক্রমণ। এ কঠিন ও নির্মম আঘাত তিনি নীরবে সহ্য করে নিলেন; এবং অনুরোধ করলেন, তোমরা এসব কথাবার্তা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখো। আর কাউকে বোলো না।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তারা তো তাঁর সে কথা রাখলই না; বরং উল্টো বাজারের নোংরা, দুশ্চরিত্র, লম্পট, ক্রীতদাস ও চোর-ডাকাতদের তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিয়ে বলল, যাও, এই লোকটিকে এই এলাকা থেকে বের করে দিয়ে এসো। এই শয়তানেরা তাঁর পিছু নিল। হইচই করতে লাগল, গালাগালি করতে লাগল, আর সেই সাথে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বসে পড়তেই তারা আবার তাঁর হাত ধরে তুলে দিতে লাগল; আবার পথ চলতেই আবারো পাথর মারতে লাগল আর সাথে সাথে পাশবিক উল্লাসে ফেটে পড়তে লাগল। রক্তের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পায়ের জুতা দুটি রক্তে ভর্তি হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্তবিহীন অত্যাচারের দৃশ্য দেখার জন্য অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। অবশেষে তিনি শহর থেকে বেরিয়ে এক বাগানের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এটি ছিল এক আঙুর বাগিচা। এর মালিক ছিল রবীআর দুই পুত্র উত্‌বা ও শায়বা।

এখানে বসে তিনি অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে এক দোয়া পাঠ করলেন।

এমন সময় বাগানের মালিকও সেখানে এসে পৌঁছালো। তাঁকে দেখে তার মনে একটু দয়া জাগল। সে তার খ্রিস্টান চাকরকে ডাকল। তার নাম ছিল আদ্দাস। তাকে দিয়ে সে একটি পাত্রে ভরে তাঁর জন্য আঙুর পাঠিয়ে দিল।

এই সফরে আল্লাহর বাণীবাহক ফিরিশতা জিব্রাইল তাঁকে এসে বলেন, পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতারা আপনার সেবায় উপস্থিত। আপনি চাইলে এই ফিরিশতারা তায়েফ নগরীকে দুই পাহাড়ের চাপে ধূলিসাৎ করে দেবেন।

আরো অন্যান্য স্থানে ইসলাম প্রচার

মক্কায় ফিরে এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্রের বসতিগুলিতে ইসলামের পয়গাম নিয়ে যেতেন। কখনো বা মক্কার বাইরে চলে যেতেন, কখনো বা মক্কায় যাতায়াতকারী মুসাফিরদের কাছে ইসলামের আহ্বান পেশ করতেন।

ইতিমধ্যে একদিন তিনি বনুওয়ান্দা গোত্রেও গেলেন। সেই গোত্রের সরদারের নাম ছিল মালিহা।

বনু আবদুল্লাহ গোত্রেও পৌঁছালেন। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন : 'তোমাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল আবদুল্লাহ, তোমরাও তাই (আল্লাহর বান্দা) হয়ে যাও।'

www.nagorikpathagar.org

বনু হানিফা গোত্রেও ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলেন। তারা অত্যন্ত জঘন্যভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করল।

বনু আমীর বিন সাসা-র গোত্রেও গেলেন। গোত্রপতির নাম ছিল বুখাইরা বিন ফরাস। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'আমরা যদি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করি এবং আমরা যদি আপনার হয়ে লড়াই করে বিজয়লাভ করি, তাহলে আপনি বিনিময়ে আমদের কি নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চাইবেন, আমার পরে তাকেই নেতৃত্ব দেবেন।' বুখাইরা বলল ঃ 'তা তো ভালোই বললেন। লড়াই করে আমরা জান দেবো, আর মজা লুটবে অন্য লোকে। যান, আপনার সাথে আমাদের আর কোনো কথা নেই।'

এ সব গোত্রে তাঁর দাওয়াতের সাথী ছিলেন হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু।

সুওয়াইদ বিন সামিতের ইসলাম গ্রহণ

ইতিমধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সুওয়াইদ বিন সামিতের সাক্ষাৎ হল। তার সম্প্রদায়ে তিনি খুব সম্মানিত ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইসলামে আহ্বান জানালেন।

তিনি বললেন ঃ 'আপনার কাছে যা আছে, সম্ভবত আমার কাছেও তাই আছে।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার কাছে কী আছে?'

তিনি বললেন ঃ 'লুকমান হাকিমের বাণী।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'বয়ান করো।'

তিনি কিছু ভালো ভালো কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সুন্দর কালাম। কিন্তু আমার কাছে আছে পবিত্র কুরআন, যা তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ তাতে জ্ঞান ও আলো দুইই আছে।'

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত শোনালেন। তার মূল্য ও গুরুত্ব বুঝতে তাঁর বেশি বিলম্ব হল না। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি যখন ইয়াসরিব ফিরে যান তখন খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক তাঁকে হত্যা করে।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

মদীনায় ইসলাম

ইসলামের আওয়াজ যেভাবে আরবের দূর দূরান্তে পৌঁছে যায় সেভাবে তা মদীনায়ও পৌঁছাল।

বহুকাল পূর্ব থেকেই ইহুদিরা মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল এবং মদীনার নিকটবর্তী স্থানগুলিতে তারা ছোট ছোট দুর্গও নির্মাণ করেছিল।

আউস ও খাজরাজ নামে দুই ভাই ছিল, তাদের আসল দেশ ছিল ইয়েমেন। কিন্তু কোনো এক কালে তারা ইয়েমেন ত্যাগ করে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করে। বংশ পরম্পরায় তারা বৃহৎ দুটি বংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তা আউস ও খাজরাজ নামে পরিচিতি লাভ করে। এরাই পরতীকালে মক্কাত্যাগী মুসলিম শরণার্থীদের আশ্রয় ও সাহায্য করার ফলে আনসার নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

এরা মদীনা শহরের নিকটবর্তী স্থানগুলোতে ছোটবড় অনেক দুর্গ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব লোকেরা মূর্তিপূজা করত। পরে ইহুদিদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করার ফলে রিসালাত, ওহী, আসমানী কিতাব ও পরকাল সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ও শুনে রেখেছিল। যেহেতু এদের কাছে কোনো আসমানী কিতাব মজুদ ছিল না সেহেতু ধর্মীয় বিশ্বাস ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে ইহুদিদের দ্বারা বারবার বিপর্যস্ত হত এবং তাদের কথার গুরুত্ব দিতে বাধ্য হত।

এরা ইহুদি ওলামাদের কাছ থেকে শুনে রেখেছিল যে, দুনিয়ায় আবার একজন নবী আসবেন। যে কেউ তাঁর সহযোগিতা করলে সে বা তারা বিজয়ী হবে এবং তাঁর সহযোগীরা দুনিয়ার রাজত্ব পাবে। এসব জানা থাকার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছালে তা গ্রহণ করার ব্যাপারে আপত্তির আর কোনো কারণ ছিল না।

যে সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় বেশ জোরে-শোরে ইসলাম প্রচার করছিলেন, সে সময়ে আনাস বিন রাফা মক্কায় এসে উপস্থিত হন। তাঁর সাথে বনী আবুল আশহালেরও কিছু

www.nagorikpathagar.org

নবযুবক এসেছিল, যাদের মধ্যে আয়াস বিন মুআজও ছিল। এসব লোকেরা কুরাইশদের সাথে নিজেদের গোত্র খাজরাজ-এর তরফ থেকে একটা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে এসেছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুরতে ঘুরতে তাদের কাছে এসে হাজির হলেন এবং বললেন ঃ 'আমার কাছে এমন কিছু বস্তু আছে, যা সকলের কল্যাণের জন্য এসেছে। তোমরা কি তা শুনতে রাজি আছো?

তারা বলল ঃ 'কি সে জিনিস?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমি আল্লাহর রসূল। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আমি আল্লাহর বান্দাদের কাছে প্রচার করছি যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে। মূর্তিপূজা না করে। আমার কাছে আল্লাহর কিতাব মজুদ রয়েছে।'

তারপর তিনি ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করার পর পবিত্র কুরআনও পাঠ করে শোনালেন।

নব যুবক আয়াস বিন মুআজ একথা শুনেই বলে উঠল ঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম! তোমরা যে জন্য এসেছো, এ তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।'

আনাস বিন রাফেআ মুঠিভর্তি কাঁকর নিয়ে আয়াসের মুখে নিক্ষেপ করে বলল ঃ 'চুপ কর। আমরা এখানে এজন্য আসিনি।'

আয়াস ফিরে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই নিহত হন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হৃদয়ে যে সত্যের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় তা ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে চলে গেলেন।

এ বুয়াসের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। এ যুদ্ধ আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে জমাদ আজদি মক্কায় আসে। সে ছিল ইয়েমেনের বাসিন্দা এবং সে যুগের আরবের একজন বিখ্যাত যাদুকর। যখন সে শুনল যে, মুহাম্মাদকে জ্বিনে পেয়েছে,তখন সে কুরাইশদের বলল ঃ 'আমার যাদুমন্ত্রের সাহায্যে মুহাম্মাদের রোগ সারিয়ে দিতে পারি। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বলল ঃ 'মুহাম্মাদ, আসুন, আপনাকে মন্ত্র শোনাই।'

www.nagorikpathagar.org

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আগে আমার মন্ত্র তো শোনো'– তারপর তিনি শোনালেন ঃ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তাঁর নিয়ামতের প্রশংসা আদায় করি এবং সমস্ত কাজেই তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না; আর আল্লাহ যাকে পথ না দেখান কেউ তাকে সে পথের পথিক বানাতে পারে না। আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশী নেই। আমি একথাও ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল।' এর পর বলার কথা এতটুকু যে– জমাদ এ পর্যন্ত শুনেছিল। সে সাথে সাথে বলে উঠল, তাঁর কলেমা আবার একটু শোনান। দু'বার, তিনবার সেই কলেমা শুনল এবং তৎক্ষণাৎ আবেগমথিত কণ্ঠে বলে উঠল ঃ 'আমি অনেক জ্যোতিষীর বাণী শুনেছি, অনেক যাদুকরের মন্ত্র শুনেছি, অনেক কবির কবিতা শুনেছি; কিন্তু এমন হৃদয়স্পর্শী বাণী আমি আর কখনো শুনিনি। এ কলেমা তো অথৈ সমুদ্রের মতো গভীর। মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র উদ্দেশে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি তা গ্রহণ করে ধন্য হয়ে যাই।'

ইয়াসরিবের ছয় পবিত্রাত্মা

নবুয়তের একাদশ বর্ষের হজ্ব মওসুমের কথা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় মক্কা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে আকাবা নামক স্থানে কিছু লোকের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। এ আওয়াজ শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই লোকেদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এঁরা ছিলেন ছয় জন। এঁরা ইয়াসরিব (মদীনা) থেকে এসেছিলেন।

তাদের সামনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর মহত্বের প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের আল্লাহতা'লার মহব্বতের প্রতি আকর্ষণ করলেন। মূর্তিপূজার অসারতা বুঝিয়ে তার সর্বনাশের কথা শুনিয়ে দিলেন। পুণ্যকর্ম ও পবিত্র জীবনের শিক্ষার কথা শোনালেন এবং পাপ ও মন্দকর্ম হতে বিরত হওয়ার আহ্বান জানালেন। পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে তৌহিদের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন। এরা ছিলেন পৌত্তলিক; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের শহরের ইহুদিদের মুখে অনতিবিলম্বে একজন নবী আগমনের কথা শুনেছিলেন। এই শিক্ষা থেকে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নিজ মাতৃভূমিতে

www.nagorikpathagar.org

ফিরে গিয়ে সেই আলো সর্বত্রই ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তারা সকলের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিলেন- 'সমগ্র বিশ্ব এতদিন যাবৎ যে প্রিয়নবীর প্রতীক্ষায় দিন অতিবাহিত করছিল, আমরা নিজ কানে তাঁর কণ্ঠ হতে পবিত্র বাণী শুনেছি, আমরা স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছি; আমরা এতটা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ তাঁকে আমাদের যুগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং আল্লাহ আমাদের জীবিত থাকতেই তাঁকে দর্শনের সৌভাগ্য দান করেছেন। এত বড় সৌভাগ্য অর্জনের পর জীবনমৃত্যু আমাদের কাছে তুচ্ছ ছাড়া আর কি হতে পারে?'

আকাবার প্রথম বাইয়াত

এসব লোকেদের প্রচারের পরিণামে ইয়াসরিবের ঘরে ঘরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম চর্চিত হতে লাগল। এরপর নবুয়তের একাদশ বছরে ইয়াসরিবের ১২ ব্যক্তি মক্কায় এসে হাজির হলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

এরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে যে মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল এই ঃ

১. আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করব এবং কাউকে তাঁর অংশীদার বলে মেনে নেবো না।

২. আমরা চুরি ও ব্যভিচার করব না।

৩. আমরা আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না।

৪. আমরা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করব না এবং কারো পিছনে নিন্দা-কুৎসা প্রচার করব না।

৫. আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত মত ও পথ অনুসরণ করব।

প্রত্যাবর্তনের সময় তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, মদীনায় ইসলামের শিক্ষা দানের জন্য একজন ব্যক্তিকে সেখানে প্রেরণ করা হোক। ফলে, হযরত মুসআব বিন উমাইরকে তাঁদের সাথে মদীনায় পাঠানো হল।

হযরত মুসআব বিন উমাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক যুবক ছিলেন। তিনি যখন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে পথ চলতেন, তখন তাঁর সামনে-পিছে চাকররা তার পায়রবি করত। অতি মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁর অঙ্গে শোভা পেতো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর

www.nagorikpathagar.org

তাঁর কাছে এসব মেকি বলে প্রতীত হয়। তিনি একেবারে সাদামাটা জীবন গ্রহণ করেন। যে সময়ে তিনি মদীনায় ইসলাম প্রচার করতেন, সে সময়ে তাঁর কাঁধে মাত্র ছোট একটি কমদামী কম্বল শোভা পেতো।

হযরত মুসআব বিন উমাইর রাজিয়াল্লাহু আনহুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার পরিণামে মদীনার সর্বত্রই ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে গেল।

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত

হযরত মুসআব রাজিয়াল্লাহু আনহুর অক্লান্তভাবে দ্বীন প্রচারের কল্যাণে মদীনার সমস্ত গোত্রে ইসলাম পৌঁছে গেল। এর ফলে, পরবর্তী বছরে ৭৩ পুরুষ ও ২ মহিলার একটি কাফেলা ইয়াসরিব থেকে রওনা হয়ে মক্কায় পৌঁছাল। ইয়াসরিবের মুসলমানরা প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদীনায় আসার জন্য দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে প্রিয়নবী সে দাওয়াত গ্রহণ করেন।

সাচ্চা ঈমানদার ও নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদের দল রাতের আঁধারে সেখানে গিয়ে পৌঁছালো, যেখানে ইয়াসরিবেরই আরেকটি ছোট দল দু'বছর আগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। এদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাসকে সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন।

চাচা আব্বাস (তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) সে সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক কথা উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন ঃ 'লোকসকল! তোমরা জানো যে, মক্কায় কুরাইশরা মুহম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাতশত্রু! তোমরা যদি তাঁর সাথে কোনো শপথ বা অঙ্গীকার করো, তাহলে জেনে রেখো তা অতি শক্ত ও কঠিন কাজ। মুহম্মদের সাথে শপথ বা অঙ্গীকার করা আর সমগ্র আরব জগতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া একই কথা। যে সিদ্ধান্তই তোমরা গ্রহণ করো না কেন, তা গভীরভাবে ভেবেচিন্তে করো; বরং ভালো হবে যদি তেমন কিছু না করো।'

তখন এই নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করল ঃ 'হুজুর আপনি কিছু বলুন।'

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

হিজরতের আদেশ

উকবার দ্বিতীয় বাইয়াতের পর মুসলমানদের উপর কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচার সহ্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেল। ফলে, জন্মভূমি ও মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে চলে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় রইল না।

হিজরতের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ামাত্রই মুসলমানরা ঘরবাড়ি, জমি-জায়গা, ক্ষেত-খামার, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে পর্যায়ক্রমে মদীনা অভিমুখে রওনা দিতে লাগলেন। কিন্তু যাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অত্যাচারিতদের এই দেশত্যাগ, সেই কুরাইশরা তাদের যাত্রাপথে বাধা দিয়ে জুলুম-অত্যাচারের আবার একটি মাত্রা যোগ করল।

এরকম এক অত্যাচারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন উম্মে সালমা রাজিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন ঃ 'আমার স্বামী আবু সালমা হিজরতের উদ্দেশ্যে আমাকে উটের পিঠে বসিয়ে নিলেন। আমার কোলে ছিল আমার শিশুকন্যা সালমা। আমরা যখন যাত্রা শুরু করলাম, তখন আমার গোত্রের লোকেরা এসে আমাদের ঘিরে ধরল এবং আমার স্বামীকে বলল ঃ 'তুমি যেতে পারবে কিন্তু আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবে না।' এরই মধ্যে আবু সালমার গোত্রের লোকেরাও এসে গেল। তারা বলল ঃ 'তুই যাবি যা; কিন্তু বাচ্চা আমাদের বংশজাত; তাকে নিয়ে যেতে দেবো না।' এই বলে বনু আবদুল আসাদ শিশুকন্যাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং বনু মুগীরাহ উম্মে সালমা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে নিয়ে গেল।' এর ফলে, আবু সালমা বাধ্য হয়ে একাই মদীনায় চলে গেলেন; উম্মে সালমা ও তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বউ-বাচ্চা ছেড়ে হিজরতের সওয়াব লাভ করলেন।

এই জুলুম-অত্যাচার ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও এক-এক, দুই-দুই করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মক্কার সমস্ত মুসলমানরা প্রিয় মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন। বাকী রইলেন মাত্র প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবুবকর ও হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁদের পরিবার-পরিজন। কুরাইশরা যখন দেখল যে, মুসলমানরা একে একে সবাই মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে দলবদ্ধভাবে

www.nagorikpathagar.org

বসবাস শুরু করেছে এবং তারা শক্তিশালী হয়ে তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তারা স্পষ্টতই অনুভব করল যে, এই ঐক্যের ভিত ধ্বংস করতে না পারলে তাদের আর নিস্তার নেই; তাদের জীবন-যৌবন, ধন-মান সব ধূলায় মিশে যাবে। সেজন্য তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, সবকিছুর মূলে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দুনিয়া থেকে তাঁকে সরিয়ে দিতে পারলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। অবশেষে তারা এই মর্মে একমত হল যে, সমস্ত গোত্র থেকে একজন করে বীর যুবার সমন্বয়ে গড়া এক বাহিনী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে সবাই মিলে তাঁকে হত্যা করবে। এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সবাই মিলে মোকাবিলা করবে।

এই ছিল তাদের ফায়সালা। আর অন্যদিকে স্বয়ং খোদাতা'লা আরেক ফায়সালা করে রেখেছিলেন, যা ছিল শত্রুদের কল্পনারও অতীত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর হিজরতের আদেশ এসে গিয়ে গিয়েছিল। এদিকে শত্রুরা তাঁর বাড়ি অবরোধ করে রেখেছিল আর ওদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমানতের সমস্ত সহায়-সম্পদ হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বুঝিয়ে দিয়ে হিজরতের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং সওর গুহায় গিয়ে লুকিয়ে রইলেন।

হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্র আবদুল্লাকে আগেই বলে রেখেছিলেন যে, শত্রুদের সার্বিক অবস্থা এবং সারাদিনের সমস্ত কার্যক্রম রাতের আঁধারে সেখানে গিয়ে যেন তাঁদের জানিয়ে আসে। এরকমই তাঁর চাকর আমীর ফুহাইরাকে বলে রেখেছিলেন, সারাদিন ধরে এখানে সেখানে ঘুরে মেষ চরাবার পর মেষের পাল নিয়ে সে যেন সওর গুহার কাছে চলে আসে। এরকমই তিনি তাঁর কন্যা আসমা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে বলে রেখেছিলেন, রাতের অন্ধকারে তিনি যেন তাঁদের খাদ্যসামগ্রী সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

মক্কাবাসীরা তাঁদের খুঁজে বের করার জন্য অনেক চেষ্টা করল কিন্তু কোথাও তাঁদের খুঁজে পেলো না। তাঁদের না পেয়ে যখন তারা নিরাশ হয়ে গেল তখন আবদুল্লাহ বিন উরাইকাত পরামর্শানুযায়ী উটনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তারই পিঠে তাঁদের বসিয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

ইতিমধ্যেই সুরাকা বিন মালিক বিন জাসম পিছু অনুসরণ করে তাঁদের নিকটবর্তী স্থানে এসে গেল। তাদের নিকটে পৌছাবার আগেই তার দ্রুতগামী ঘোড়া টক্কর খেয়ে মাটিতে উল্টে গেল এবং সে নীচে পড়ে গেল। কোনো রকমে সামলে নিয়ে সে আবারো ঘোড়া হাঁকালো কিন্তু নিকটে পৌছাবার আগেই ঘোড়া আবারো টক্কর খেয়ে পড়ে গেল। এবার ঘোড়ার সামনের পা দুটি মাটিতে দেবে গেল।

সুরাকা এবার সাহস করে আবারো এগুতে চাইল কিন্তু আর পারল না। তার মনোবল ভেঙে গিয়েছিল এবং সে একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। এবার সে নিরুপায় হয়ে দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। নিরাপত্তা দেওয়া হল। সুরাকা ফিরে চলল এবং যাওয়ার আগে সে বলে গেল ঃ 'পথে অগ্রসরমান সমস্ত হামলাকারীকে আমি রুখে দেবো।' সে তা করেছিল।

মদীনায়

হিজরতের ত্রয়োদশ বছরের ৮ রবিউল আউয়াল সোমবার, মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় পৌছালেন।

মদীনাবাসীরা শুনেছিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ত্যাগ করে মদীনার পথে রওনা দিয়েছেন, তারপর থেকে তারা প্রতিদিন সকালে মদীনার বাইরে গিয়ে তাঁর জন্য দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করত; তারপর ঘরে ফিরে আসত। একদিন লোকেরা অনেক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করার পর ফিরে আসার জন্য রওনাও দিয়েছিল। এদিকে প্রিয়নবীও পৌছে গিয়েছিলেন। আনন্দে আত্মহারা এক ব্যক্তি খুব জোরে সবাইকে আহ্বান করে বলল ঃ 'আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌছে গিয়েছেন।' সাথে সাথে চারিদিক থেকে এসে সবাই তাঁকে পরম আপনজনের মতো ঘিরে ধরল।

এমন কিছু মুসলমান ছিল যাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনো দেখেনি। ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে তারা পার্থক্য করতে পারছিল না। একথা বুঝতে পেরেই আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপরে একটি কাপড় ধরে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে গেলেন। ফলে, লোকেদের বিভ্রান্তি কেটে গেল।

www.nagorikpathagar.org

মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত সুন্দর একটি জায়গার নাম কুবা। সেখানে অনেক আনসারের বসবাস ছিল। তাঁদের মধ্যে আমর বিন আউফ ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত বংশ। তাদের প্রধান ব্যক্তির নাম ছিল কুলসুম বিন হদম। ইনিই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় সর্বপ্রথম যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং কুবায় তাঁর গৃহেই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হিজরতের তিন দিন পরে মক্কা ছেড়ে মদীনার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন এবং তিনিও এখানে এসে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

কুবায় প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম কাজ ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ করা। তাঁর পবিত্র হাতে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল এবং সাথীদের নিয়ে অবিলম্বে সেই মসজিদের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করলেন।

কিছুদিন কুবায় অবস্থানের পর তিনি মদীনার উদ্দেশে রওনা হলেন। সেদিন ছিল জুম্মাবার। রাস্তায় বনু মালিকের মহল্লায় জুহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। সেখানে তিনি জুমআর নামায পড়লেন এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ (খুৎবা) দিলেন। এ ছিল ইসলামের প্রথম জুমআ।

জুমআর নামাজ সমাপন করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াসরিবের দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে প্রবেশ করলেন। সেই দিন থেকেই শহরের নাম হয়ে গেল মদীনাতুন্নবী (অর্থাৎ নবীর শহর, যা বর্তমানে মদীনা মুনাওওয়ারা নামে সুপরিচিত)।

তাঁর মদীনায় প্রবেশের সময় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। মদীনার অলি-গলিসহ সর্বত্রই আল্লাহর পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর প্রশংসায় সমগ্র মহানগর মুখরিত হয়ে উঠেছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁর পবিত্র চেহারা দর্শন ও সাক্ষাতের জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল।

আনসারদের অনিন্দ্যসুন্দর নিষ্পাপ মেয়েরা মনমনোহর আওয়াজে প্রাণ মাতানো সুরে গেয়ে চলেছিল এই গীতটি–

'আশারকাল বদ-রু আলাইনা মিন সনী ইয়াতিল বিদায়ী।
ওয়াজাওয়াশশুকরু আলাইনা মা দাআ লিল্লাহি দায়ী।
আইয়ুহাল মাবঊসু ফীনা জি' তাবিল আমরিল মুতায়ী।।'
'বিদা-পাহাড়ের উপরে দেখো উঠেছে চতুর্দশীর চাঁদ।
লক্ষ-কোটি শোকর জানাই খোদার তরে আমরা সবাই
খোদার হুকুম ফরজ আজি লক্ষ-কোটি ধন্যবাদ।।'

এই নিষ্পাপ কন্যারা দফ বাজিয়ে বাজিয়ে এই গীতটি গাইছিল।

তারা আরো গাইছিল ঃ

www.nagorikpathagar.org

'নাহনু জওয়ারিন মিন বনীন নাজ্জারী।
ইয়া হাব্বাজা মুহাম্মাদান মিন জারী।।
'আমরা সবাই নাজার-কন্যা আমরা কতনা খুশী।
দ্বিনের নবী মুহাম্মাদ আমাদের প্রতিবেশী।।'

এইভাবে মদীনায় প্রবেশের সময় প্রত্যেক আনসার ও জানিসার কামনা করছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। প্রতিটি গোত্রের লোকই এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে সবিনয়ে নিবেদন করছিলেন ঃ 'হুজুর! এই আমার ঘর। তা আপনার জন্যই। গ্রহণ করুন, ধন্য হই।' কিন্তু এ ছিল এক কঠিন পরিস্থিতি। কঠিন প্রশ্ন। তার জবাব খুব সহজ ছিল না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমার উট যেখানে গিয়ে বসে পড়বে, আমার আতিথ্য সেখানেই মঞ্জুর।' উটনী চলতে চলতে আবু আইয়ুব আনসারীর অংশে এসে বসে পড়ল। বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত সেখানেই। এর কাছেই ছিল তাঁর বাড়ি। এ ছিল দ্বিতল গৃহ। তিনি উপরের অংশটি পেশ করলেন। লোকেদের যাতায়াত ও দেখা-সাক্ষাতের সুবিধার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচের অংশটিই পছন্দ করলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী সেটি তাঁকে দিয়ে সপরিবারে উপরের অংশে চলে এলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত মাস যাবৎ এখানে অবস্থান করলেন। এরপর যখন মসজিদে নববীর কাছে তাঁর বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হল, তখন তিনি সেখানে চলে গেলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বংশের অন্যান্য লোকেরা মদীনায় চলে আসেন।

মদীনায় পৌঁছানোর পর

১. মদীনায় আগমনের পর সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে জরুরী কাজ ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ। যেখানে এসে তিনি বসবাস করছিলেন তার নিকটেই একটি পতিত জমি পড়েছিল। তার মালিক ছিল এতিম দুই ভাই। তাদের কাছ থেকে এই জমি কিনে নেওয়া হল। সেখানেই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে কাজে যোগ দিলেন। নিজ হাতে পাথর উঠিয়ে দেওয়াল গাঁথার কাজে সহযোগিতা করলেন। অনতিবিলম্বেই মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হল। খুব সাদামাটাভাবে এটি নির্মিত হয়েছিল। কাঁচা ইটের দেওয়াল, খেজুর পাতার ছাদ ও খেজুর গাছের গুঁড়ির খুঁটি ও আড়া দিয়ে তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রথমে মসজিদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রাখা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিল, কেননা, তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। পরে যখন কিবলা কাবা শরীফের দিকে স্থাপিত হয়, তখন মসজিদের কেবলা কাবামুখী করে দেওয়া হয়। মসজিদের মেঝে কাঁচা হওয়ার দরুন বৃষ্টির সময় তা ভিজে ও পিছল হয়ে যেতো। কিছুদিন পরে মেঝে পাকা করা হয়।

মসজিদের একপ্রান্তে একটা চবুতরা ছিল, যাকে সুফফা বলে। ঐ জায়গাটিতে সে সব মুসলমানরা বাস করত, যাদের কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। তার নিকটেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিদের বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল।

২. মক্কা থেকে যে মুসলমানরা বাড়িঘর ছেড়ে মদীনায় এসেছিলেন, তারা সকলেই প্রায় অসহায় অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিলেন। তাঁদের মধ্যেকার অবস্থাপন্ন লোকেরাও তাদের সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন; সাথে করে প্রায় কিছুই আনতে পারেননি। যদিও এসব মুহাজির মদীনার মুসলমানদের (আনসারদের) অতিথি ছিলেন; তা সত্ত্বেও তাদের সুস্থভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। এসব লোকেরা নিজহাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে খুবই পছন্দ করতেন। অবশেষে যখন মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের ডাকলেন এবং বললেন ঃ 'মুহাজিররা তোমাদের ভাই। তারপর এক এক আনসার ও এক এক মুহাজিরকে ডেকে ডেকে বললেন, আজ থেকে তোমরা একে অন্যের ভাই। এইভাবে সমস্ত মুহাজির ও আনসারকে একে অন্যের ভাই বানিয়ে দিলেন। বললেন ঃ 'সমস্ত মুসলমান একে অন্যের ভাই'– এইভাবে তাঁরা একে অন্যে ভাইয়ের চেয়েও যেন অধিক হয়ে গেলেন।

আনসাররা মুহাজিরদের তাদের নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজেদের সমস্ত সহায়-সম্পদের পূর্ণাঙ্গ হিসেব কষে তাদের সামনে রেখে দিয়ে বললেন, এর অর্ধেক তোমাদের, অর্ধেক আমাদের। বাগ-বাগিচায় উৎপন্ন ফসলাদি, ঘরের জিনিসপত্র, বাড়ি, জমিজায়গা সমস্ত কিছুই সহোদর ভাইদের মতো সমানভাবে বণ্টন করে নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এইভাবে গৃহহীন, আবাসহীন মুহাজিররা শান্তিতে বসবাসের জন্য বাড়ি-ঘর পেলেন কিন্তু মুহাজির সাহাবীরা বললেন, আমাদের কাজের ব্যবস্থা করে নিন। আমরা শ্রম দিয়েই জীবিকার ব্যবস্থা করবো। অতএব, বহু সংখ্যক মুহাজির ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করলেন, দোকান-পাট খুললেন এব অন্যান্য কাজকর্মে নেমে পড়লেন। এইভাবে মুহাজিরদের সুস্থভাবে বসবাসের সুবন্দোবস্ত করা হল এবং মদীনায় এক সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ার শুভ সূচনা হল।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়
মদীনার নতুন অবস্থা

মদীনায় বহু গোত্র ও বহু রকমের ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বসবাস ছিল। সেখানে কিছুসংখ্যক ইহুদিও বাস করত। ইহুদিদের মধ্যে বনু নজীর, বনু কায়নুকা, বনু কুরায়জার মতো গোত্রের লোকেরা ছিল খুব ধনী ও প্রতিপত্তিশালী। তারা ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে বসবাস করত। তারা ছিল জঘন্য সুদখোর। সেই সুবাদে তারা প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে ছিল।

এমনিতেই ইহুদিরা মুসলমানদের কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করত না; বরং সুযোগ পেলেই তাদের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করত।

এই অবস্থা ছিল খ্রিস্টানদেরও। তারা যখন দেখল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খ্রিস্টানদের প্রচলিত ত্রিত্ববাদী ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে ইসলামের শক্তিশালী ও যুক্তিসঙ্গত মতবাদ দিয়ে ত্রি-ঈশ্বরের ধারণাকে খণ্ডন করে কুরআনের আলোকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মের ব্যাখ্যা করছেন এবং নিজে তৌহিদের অকাট্য বাণী ও ধর্মমত প্রচার করছেন, তখন তারা মনে করল যে, তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে; ফলে, তারাও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমন হয়ে গেল।

মদীনার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল-এর ভূমিকার প্রতিও নজর দেওয়া দরকার। ইহুদিদের বাইরে এ লোকটি ছিল মদীনার অন্যতম প্রভাবশালী লোক। আউস ও খাযরাজ গোত্রের উপর তার খুব প্রভাব ছিল। তার আশা ছিল যে, এসব শক্তিশালী গোত্রগুলির সহায়তায় মদীনায় একচ্ছত্র অধিপতি হবে। যখন সে দেখল যে, আউস ও খাজরাজ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন সেও (বদরের যুদ্ধের পর) লোকদেখানো ভাবে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু যখন দেখল যে, ইহুদিরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রু হয়ে গেছে, তখন সে চাইল ইহুদিদের উপরেও তার আগের মতো প্রভাব বজায় থাকুক এবং ইসলাম গ্রহণকারী গোত্রগুলির উপরেও তার প্রভাব আগের মতোই বজায় থাকুক। এই উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য সে মুসলমানদের সঙ্গে তার বন্ধত্ব জাহির করত এবং অন্যান্য গোত্রের সাথেও সে সমভাবে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলত।

ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিক- এই তিন সম্প্রদায় এখন ইসলাম ও মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রুতে পরিণত হয়ে গেল। এদের মোকাবিলা

www.nagorikpathagar.org

করবার জন্য এখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদের মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসে বসবাস শুরু করার পর মুসলমানদের জন্য মদীনা ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। সেই রাষ্ট্রকে সুগঠিত ও সুসংহত করে তোলার জন্য মুসলমানদের শক্তভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায়, ইসলাম-বিরোধী শত্রুদের ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তা সমূলে বিনাশ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তিন শত্রুর মোকাবিলার জন্য এই পরিকল্পনাই গ্রহণ করলেন।

বদরের যুদ্ধ

মদীনায় মুসলমানরা বসবাস শুরু করলেন। তখনো মক্কার কুরাইশরা স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। মদীনায় ইহুদিরা মুসলমানদের আলাদা একটা শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, তখনো পর্যন্ত তারা একটা সমঝোতা-চুক্তি মেনে চলেছিল। মদীনার মুনাফিকরা প্রকাশ্য শত্রুতায় তখনো অবতীর্ণ হয়নি। যখন সে শত্রুতা প্রকাশ পেল, তখন মুসলমানদের ক্ষতি করার শক্তি ও সাহস তাদের আর ছিল না।

মক্কার কুরাইশরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের কি জঘন্যতম শত্রু ছিল তা লক্ষ্য করার মতো। মুসলমানরা মাতৃভূমি ত্যাগ করে মক্কা থেকে ৩০০ মাইল দূরে মদীনায় গিয়ে বসতি স্থাপন করল। তা সত্ত্বেও তারা স্বস্তি পেলো না। এবার তারা মদীনা আক্রমণ করে মুসলমানদের সমূলে বিনাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। ইতিমধ্যে ২ হিজরি সনের শাবান মাসে (ফেব্রুয়ারী বা মার্চ ৬২১ খ্রি.) কুরাইশদের এক বিশাল কাফেলা সিরিয়া থেকে বাণিজ্য করে ফিরছিল। তাদের কাছে প্রায় ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার সমান ধন-সম্পদ ছিল। তারা চলতে চলতে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে এসে উপস্থিত হল। তা মুসলমানদের নজর এড়ায়নি। কাফেলার সাথে ত্রিশ-চল্লিশ জনের বেশি লোক ছিল না। মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌছানোর পর তারা আশঙ্কা করল যে, মুসলমানরা কাফেলা লুট করতে পারে।

কাফেলার নেতা ছিল আবু সুফিয়ান। অজানা এক বিপদাশঙ্কায় সে সাহায্যের জন্য মক্কায় অতি দ্রুত একজন লোককে পাঠিয়ে দিল। তারপর সেই লোকটি মক্কায় এসে চীৎকার করে জানিয়ে দিল ঃ 'মুসলমানরা কাফেলা আক্রমণ করেছে। সাহায্যের জন্য অবিলম্বে ছুটে চলো।'

www.nagorikpathagar.org

কাফেলার বাণিজ্য-সম্ভারের সাথে মক্কার বহু লোকের জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক ছিল। ফলে, তাদের মধ্যে তা ব্যাপক গাত্রদাহ সৃষ্টি করল; এবং তা এক জাতিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এই আওয়াজ শুনে কুরাইশ-কুলের তা বড় বড় নেতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সাথে সাথে এক হাজার নবযুবকের এক বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। প্রবল প্রতাপের সাথে মক্কা থেকে এই বাহিনী মদীনার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। তাদের ইচ্ছা সমস্ত মুসলমানকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দেবে যাতে সমস্ত ঝামেলা একেবারে চুকে যায়।

একদিকে তাদের সম্পদ রক্ষার ইচ্ছা, অন্যদিকে পুরাতন শত্রুতার নিপাত সাধন– এই উদ্দেশ্যে তারা মদীনা আক্রমণের জন্য এগিয়ে চলল।

এদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পুরো পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে সমস্ত ঘটনা তাঁর গোচরীভূত হচ্ছিল। তিনি অনুভব করলেন, এবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কুরাইশদের আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ হয় তাহলে মুসলমানদের অস্তিত্বের সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে, আর যদি ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়, তাহলে দৃঢ় পদভরে তার মোকাবিলা করতে হবে। তা না হলে দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য মুছে যাবে।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, এই পরিস্থিতিতে যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেখানেই ফায়সালা হবে— জয় হকের না বাতিলের?

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের আহ্বান করে একত্রিত করলেন এবং সমস্ত পরিস্থিতি তাদের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'মদীনার উত্তর প্রান্ত দিয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা অতিক্রম করছে, অন্যদিকে দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে কুরাইশ বাহিনী তোমাদের অস্তিত্ব বিনাশের জন্য এগিয়ে আসছে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যে, যে কোনো একটাতে তোমরা বিজয় লাভ করবে। এমতাবস্থায় বলো, তোমরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোন দিকে যেতে চাও?'

জবাবে অধিকাংশ সাহাবী মত প্রকাশ করলেন ঃ 'কাফেলার উপর হামলা চালানো হোক।'

কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি ছিল আরো সুদূর প্রসারী। সেজন্য তিনি একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। এর জবাবে মুহাজিরদের মধ্য থেকে সাহাবী হযরত মিকদাদ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আনহু বললেন ঃ 'আল্লাহ্র রসূল! আপনার প্রভুর যেদিকে ইঙ্গিত সেদিকেই চলুন। আমরা আপনার সাথেই আছি। আমরা বনী ইস্রাইলের মতো একথা কখনো বলব না যে, 'যান, আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন; আমরা এখানে বসে আছি।'

কিন্তু এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আনসারদের সিদ্ধান্ত জানা ও প্রয়োজন ছিল। সেজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার তাঁদের উদ্দেশ্যে পুনরায় এই প্রশ্ন করলেন। এর জবাবে হযরত সাদ বিন মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আমরা আপনার সত্য গ্রহণ করেছি, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি, আপনার প্রচারিত সমস্ত কিছুই সত্য, তার সবই ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আপনার উপর চূড়ান্ত শপথ করেছি। হে আল্লাহর রসূল! আপনার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন। সেই সত্তার শপথ। যিনি আপনাকে সত্যনবী করে প্রেরণ করেছেন। যদি আপনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তা-ও সই। কোনো অবস্থাতেই আমরা আপনাকে ত্যাগ করব না। আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়েও লড়তে পিছপা হব না। আমরা সেখানে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। আল্লাহ চাইলে চূড়ান্ত শৌর্যের যে পরিচয় আমরা দেবো, তা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। সেই আল্লাহর অনুগ্রহের উপর ভরসা করে আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।'

এ সমস্ত বক্তব্য শোনার পর সিদ্ধান্ত হল যে, কাফেলা নয়, সরাসরি শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করা হবে। কিন্তু এ কোনো মামুলি সিদ্ধান্ত ছিল না। কুরাইশদের মোকাবিলায় মুসলমানদের আয়োজন ছিল নিতান্তই সামান্য। লড়াইয়ের উপযোগী লোকেদের সংখ্যা ছিল তিনশ'র চেয়ে সামান্য বেশি। যাদের মধ্যে দু' তিন জনের কাছে মাত্র ঘোড়া ছিল এবং উটের সংখ্যা সত্তরটির বেশি ছিল না। যুদ্ধসরঞ্জামও যথেষ্ট পরিমাণ ছিল না। ষাট ব্যক্তির কাছে মাত্র কবচ ছিল। এই কয়জন মাত্র ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বাকী লোকেদের সম্পর্কে বলা যায় যে, জেনে বুঝে নিশ্চিতভাবে তাঁরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন।

ঠিক এতটাই অপর্যাপ্ত সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ২ হিজরি সনের ১২ রমজান তারিখে ৩০০ মুসলমানকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে রওনা হলেন। প্রথমে তাঁরা সোজা দক্ষিণ পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন, যেদিক দিয়ে কুরাইশ বাহিনী এগিয়ে আসছিল। ১৬

www.nagorikpathagar.org

রমজান তাঁরা বদরের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। বদর একটি গ্রামের নাম। যেটি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে পৌঁছে জানা গেল যে, কুরাইশ বাহিনী উপত্যকার অন্য প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। সেজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে এখানেই শিবির স্থাপন করা হল।

ওদিকে শত্রুবাহিনী রণসাজে সজ্জিত হয়ে পতাকা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। সে বাহিনীতে ছিল একহাজারের বেশি সৈন্য এবং মক্কার প্রায় দু'শ সরদার তাতে সামিল ছিল। সৈন্যদের জন্য বিপুল পরিমাণ রসদের ব্যবস্থা ছিল। সেনাপতি ছিল উত্‌বা বিন রবীআ।

দুই বাহিনী যখন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল তখন এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হল। একদিকে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে উপাসনা না করার দৃঢ় সংকল্পে অটল ৩১৩ জনের এক মুসলিম বাহিনী, যাদের কাছে যুদ্ধের পর্যাপ্ত সরঞ্জামও নেই; আর অন্যদিকে পর্যাপ্ত উপকরণ সহ রণসাজে সজ্জিত সহস্রাধিক খোদাদ্রোহী কাফেরদের এক বাহিনী– যারা একত্ববাদের প্রদীপ দুনিয়ার বুক থেকে চিরকালের জন্য নিভিয়ে দেওয়ার এক অপবিত্র কামনা নিয়ে তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ইতিমধ্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর উদ্দেশে দু'হাত তুলে মর্মস্পর্শী ভাষায় মিনতি করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! এরা কুরাইশ। রণসাজে সজ্জিত হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে তোমার হক ও তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণের উদ্দেশে। হে আল্লাহ! এবার তোমার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! আজ যদি তোমার জন্য লড়তে আসা নিবেদিতপ্রাণ এই মানুষগুলির অস্তিত্ব এই মাটিতে মিশে যায়, তাহলে এই পৃথিবীতে তোমার নাম মুখে নেওয়ার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।'

এ হল ঈমানের সেই দরজা, যা লাভ করলে আল্লাহর সাহায্য আসে, অবশ্যই আসে। বদর ময়দানেও তাই এলো। আল্লাহতা'লা ৩১৩ জনের দুর্বল এক বাহিনীকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাহায্য করলেন। তাদের মোকাবিলায় সহস্রাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এমন ভয়ঙ্কর পরাজয় তাদের মেনে নিতে হল, যার পরিণামে কুরাইশদের কোমর ভেঙে গেল। এই যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের ৭০ ব্যক্তি নিহত হয়। এদের মধ্যে আরবের প্রায় সমস্ত বড় বড় সরদারই সামিল ছিল। এই নিহত সরদারদের মধ্যে শওবা, উৎবা, আবু জেহেল, জমআ, আস, উমাইয়া প্রমুখ ব্যক্তিরা

www.nagorikpathagar.org

ছিল। যারা ছিল সমাজের সবচেয়ে নামকরা গোত্রপতি। এদের নিধন কুরাইশদের কোমর ভেঙে দিয়ে গেল।

মুসলমানদের মধ্য থেকে ছয় মুহাজির ও আট আনসার শাহাদত বরণ করেছিলেন।

কয়েদী ঃ যারা ধরা পড়েছিল

বদরের বন্দীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহারের তুলনা মেলা ভার।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহারের যে নিদর্শন রেখেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে মুক্তি,

২. ক্ষতিপূরণ দিতে অপারগ হলেও মুক্তি।

বদরের যুদ্ধবন্দীদের সকলেই ছিল মক্কার লোক যারা মুসলমানদের জঘন্য শত্রু ছাড়া আর কিছু ছিল না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে প্রথমেই তাঁর সাথীদের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিকী রাজিআল্লা আনহু প্রস্তাব দিলেন, জরিমানার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবের পিছনে যে উদ্দেশ্যেই কাজ করুক না কেন, তা ছিল মানবিক সিদ্ধান্ত। মানবতার খাতিরেই এই প্রস্তাব পেশ করা হয়। এর পিছনে আরো উদ্দেশ্য ছিল, তা হল, নিজেদের ভুল শুধরে তারা ইসলামের পতাকাতলে আসতে পারে এবং ইসলাম, মুসলমান, মনুষ্যত্ব ও মানবতার কল্যাণে নিজেদের নিবেদিত করতে পারে। বাস্তবিকই তাই হয়েছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই পরবর্তীকালে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

বাস্তবিকই বদরের ৭২ যুদ্ধবন্দীর মধ্য থেকে অনেককেই জরিমানা নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধবন্দীদের অতিথির সম্মানে রাখা হয়েছিল। সেই বন্দীরা পরবর্তীকালে তা বর্ণনাও করে গিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, মদীনাবাসীরা তাদের সন্তানদের মতো করে তাদের সেবা করেছেন। কেবলমাত্র দুই বন্দীকে– উকবা বিন আবু মুয়িত ও নজর বিন হারিসকে পূর্বে কৃত অপরাধের দরুন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

যে বন্দীরা দারিদ্র্য বশত ক্ষতিপূরণ দিতে অসমর্থ ছিল অথচ লেখাপড়া জানত, তাদের এই শর্তে মুক্তি মঞ্জুর করা হল যে, তারা এক এক ব্যক্তি দশজন করে বাচ্চাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে।

বদরের যুদ্ধ ও তার বিজয়ের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই যুদ্ধ ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আযাবের প্রথম কিস্তি। যা ইসলামের আহ্বান

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের উপর নিপতিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ একথাই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য কী এবং এর পরিণামই বা কী? এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে আরবের অন্যান্য গোত্রে ইসলাম ও মুসলমানদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল।

বদর যুদ্ধের পরে

বদর যুদ্ধে যদিও মুসলমানরা জয়লাভ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, মুসলমানরা শত্রুদের বুকের ছাতায় পাথর মেরেছিলেন। বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ– যে যুদ্ধে কুফরি-শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানরা কঠিন মোকাবিলা করেছিলেন এবং বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এ ঘটনায় সমগ্র আরব দুনিয়া চমকে উঠেছিল।

বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পরের ঘটনা। সফওয়ান বিন উমাইয়া ও উমাইর বিন ওয়াহাব মক্কা থেকে দূরে এক বিরান মরুভূমিতে বসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে লাগল। সফওয়ানের পিতা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং ওয়াহাবের পুত্র মুসলমানদের কাছে বন্দী জীবন যাপন করছিল।

উমাইর বলল ঃ 'আমার উপর যদি ঋণের বোঝা না থাকত আর যা আমি আজো আদায় করতে পারিনি; আর যদি আমার পরিবার-পরিজনের চিন্তা না থাকত তাহলে আমি নিজেই মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করে আসতাম।'

সফওয়ান বলল ঃ ' তোর ঋণ আমি পরিশোধ করে দেবো, আর যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন তোর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব আমিই বহন করব।'

উমাইর বলল ঃ 'আচ্ছা, তবে একথা কাউকে বোলো না।'

তারপর উমাইর তার তরবারি শান দিয়ে তাতে বিশ মাখিয়ে খাপে ভরে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল।

উমাইর মদীনায় পৌছে উটের পিঠে বসে থাকতে থাকতেই তার উট মসজিদে নববীর কাছে এসে বসে পড়ল। হযরত উমর ফারুক রাজিয়াল্লাহু আনহুর সতর্ক দৃষ্টি সে এড়াতে পারল না। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে, এ শয়তান কোনো কুমতলব হাসিল করার জন্য এখানে এসেছে। তিনি দেরী না করেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন ঃ 'উমাইর বিন ওয়াহাব মুসাল্লাহ এসেছে। মনে হয়, তার উদ্দেশ্য ভালো নয়।'

www.nagorikpathagar.org

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তাকে আমার কাছে আসতে দাও।'

হযরত উমর ফারুক রাজিয়াল্লাহু আনহু তার তরবারি নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিলেন এবং তার ঘাড় ধরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে বললেন ঃ 'ওকে ছেড়ে দাও।'

তারপর বললেন ঃ 'উমাইর! তুমি আমার কাছে এসো।'

উমাইর অগ্রসর হয়ে সালাম করল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কী মনে করে এতদূর এলে?'

বলল ঃ 'আমার ছেলের খোঁজ নিতে এসেছি।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযা সাল্লাম ঃ 'তরবারি কেন?'

উমাইর বলল ঃ 'গোল্লায় যাক তরবারি। তরবারি আমার কি কাজে আসবে?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সত্যি করে বলো।'

একথার জবাবে উমাইর একই কথা বলল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি আর সফওয়ান মক্কার বিরান মরুভূমিতে বসে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছো। সফওয়ান তোমার ঋণের বোঝা ও পরিবার-পরিজনের দায়দায়িত্ব নিয়েছে। তার বিনিময়ে তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য এ পর্যন্ত এসেছো। উমাইর! তুমি একথা জেনে রাখো, আমার রক্ষাকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি তা কখনোই হতে দেবেন না।'

উমাইর একথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এবং বলল ঃ

'আজ আমি নিশ্চিত যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আপনি তাঁর প্রেরিত নবী ও রসূল। আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ যে, এই বাহানায় তিনি আজ আমাকে এ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের ভাইকে ধর্ম শিক্ষা দাও। কুরআন মুখস্ত করাও এবং তার ছেলেকে মুক্ত করে দাও।'

উমাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু নিবেদন করলেন ঃ 'আল্লাহর রসূল! আমাকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দান করা হোক। আমি সেখানে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করি। আজ আমার মন চাচ্ছে যে,

www.nagorikpathagar.org

এবার আমি পৌত্তলিকদের উপর নির্যাতন শুরু করি, যেমন আমরা পৌত্তলিক থাকা অবস্থায় মুসলমানদের উপর করেছি।'

উমাইরের মদীনায় চলে যাওয়ার পর সফওয়ান মক্কার কুরাইশ সরদারদের বলে বেড়াত যে, অনতিবিলম্বেই এমন একটা খবর তোমরা শুনবে যে,বদরের দুঃখজনক স্মৃতি তোমরা অচিরেই ভুলে যাবে। কিন্তু সফওয়ান যখন একথা শুনল যে, উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন সে শপথ করল ঃ

'পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন পর্যন্ত উমাইরের সাথে কথা বলব না; এবং কখনোই তার কোনো উপকার নিজেও করব না, অন্যকেও করতে দেবো না।'

উমাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় ফিরে এসে এমন আন্তরিকতার সাথে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন যে, একের পর এক লোক এসে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল।

বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর আবু সুফিয়ান এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, যতদিন সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ না নিতে পারবে, ততদিন সে নাওয়া-ধোওয়া পর্যন্ত করবে না। অবশেষে, দু'শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সে মক্কা থেকে প্রস্থান করল। মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে সাথীদের বাইরে রেখে রাতের অন্ধকারে সে মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। সালাম বিন মুশকম নামক ইহুদির সাথে সাক্ষাৎ করে সে সারারাত ধরে মদ পান করল। দু'জনে মিলে অনেক পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিল যে, এটা যুদ্ধের উপযুক্ত সময় নয়। সেজন্য আবু সুফিয়ান রাতের শেষভাবে সে স্থান ত্যাগ করে সসৈন্যে চলে গেল। যাওয়ার সময় মুসলমানদের ফলবান বৃক্ষ ও খেজুর গাছগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল এবং মুসলমান ও তাদের সাথীদের। যেখানে যাকে পেল, হত্যা করে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল।

খবর পাওয়ামাত্রই 'করকতুল বদর' পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করা হল। সেজন্য তা 'গজওয়াতুল বদর' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।

আবু সুফিয়ান দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার লক্ষে তার উটের পিঠে রাখা ছাতু ফেলতে ফেলতে চলে গেল, যাতে তার বোঝা হাল্কা হয়। সেজন্য তা 'গজওয়ায়ে সওয়িক' বা ছাতুওয়ালার যুদ্ধ নামেও প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

নবম অধ্যায়
উহুদের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর মক্কার পৌত্তলিক-শত্রুদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তো বড় বড় কুরাইশ সরদার ইতিমধ্যেই শপথ গ্রহণ করেছিল। মক্কার সমস্ত গোত্র সম্মিলিতভাবে প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। সারা বছর ধরে তার প্রস্তুতি চলল। ইতিমধ্যে পৌত্তলিক শত্রুরা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এ খবর যথারীতি মুসলমানদের কাছে পৌঁছে গেল।

পয়গাম্বরে ইসলাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩ হিজরি সনের শওয়াল মাসের প্রথম সপ্তাহে দুই ব্যক্তিকে সঠিক খবর অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তারা এসে জানাল যে, কুরাইশ বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেছে; এবং তাদের ঘোড়ারা স্থানীয় চারণভূমি সাফ করে ফেলেছে।

এবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন, শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা শহরে থেকে করা হবে না শহরের বাইরে গিয়ে করা হবে।

অধিকাংশ মুহাজির ও আনসার শহরের মধ্যে থেকে শত্রুবাহিনীর মোকাবিলার পক্ষে রায় দিলেন; কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি এরকম কিছু যুবক প্রবল জেহাদের আবেগে মত প্রকাশ করলেন যে, শহরের বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করা হোক।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'পক্ষেরই মতামত শুনলেন এবং গৃহে প্রবেশ করে বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে এলেন যেন দুপক্ষের মতামতই তিনি গ্রহণ করেছেন।

কুরাইশ বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে উহুদের পাহাড়ি উপত্যকায় শিবির স্থাপন করল।

প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একদিন পর জুমআর নামাজ অন্তে এক হাজার সাহাবির এক বাহিনী নিয়ে শহর থেকে প্রস্থান করলেন। এর মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাইও ছিল। যদিও লোক দেখানো ভাবে সে মুসলমান হয়েছিল কিন্তু অন্তরে সে মুসলমানদের জঘন্য শত্রু ছিল এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে মুনাফিকই ছিল। সেও

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের সাথে ছিল। তার দ্বারা প্রভাবিত আরো অনেক মুনাফিক মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। কিছুদূর গিয়ে আবদুল্লাহ বিন উবাই তার তিন শ' সহযোগীকে নিয়ে পৃথক হয়ে গেল। আর বাকী রইলেন ৭০০ নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী।

তার এই অসহযোগিতা ছিল এক জঘন্য চক্রান্ত। সে চেয়েছিল যে, এভাবে মুসলমানরা পরাজিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাক। কিন্তু যে মুসলমানদের হৃদয় ঈমানের আলোয় আলোকিত, মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী এই প্রেরণা যাদের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে বহমান ছিল, সেখানে মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের স্বপ্নসাধ কিভাবে পূর্ণ হতে পারে? এই প্রেরণায় উদ্বেলিত মুসলিম বাহিনী আল্লাহর নামে উহুদ অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন।

যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনা গণনায় মনোনিবেশ করলেন। এদের মধ্যে যারা কমবয়সী ছিল, তাদের ফিরিয়ে দিলেন। এদের মধ্যে রাফেআ ও সামুরা রাজিয়াল্লাহু আনহু নামে দু'জন বীর বালক ছিলেন। প্রথমে রাফেআকে বাহিনী থেকে পৃথক করা হল কিন্তু সে ফিরে যেতে চাইল না। সে দু'পা আঙুলের উপর স্থাপন করে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে বোঝাতে চাইল যে, সে ছোট নয়। সে বীরত্বও প্রদর্শন করল। যার ফলে, তাকে নেওয়া হল। এবার গোল বাধল সামুরাকে নিয়ে। সে বলল ঃ 'রাফেআকে নিলে আমাকেও নিতে হবে। আমি তো তাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি।' অবশেষে, প্রমাণের জন্য দুজনকে কুস্তি লড়তে দেওয়া হল। সামুরা রাফেআকে ধরাশায়ী করে ফেলল। ফলে, তাকেও বাহিনীতে নেওয়া হল। এ ছিল মাত্র ছোট্ট একটি ঘটনা; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, আল্লাহর পথে মুসলমানরা কি গভীরভাবে নিজেদের নিবেদন করেছিলেন।

মদীনা থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত উহুদের পাহাড়ি উপত্যকা। প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে সেনা মোতায়েন করলেন যে, পাহাড় পিছনে রইল আর কুরাইশ বাহিনী রইল সামনে। পিছনে ছিল দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি সংকীর্ণ রাস্তা। যে দিক দিয়ে শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সেখানে তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ সৈন্যের এক তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন ঃ 'এই গলিপথ দিয়ে কাউকে যাতায়াত করতে

www.nagorikpathagar.org

দেবে না এবং তোমরা কোনো অবস্থাতেই এই স্থান ত্যাগ করবে না। এমন কি আমাদের জয়লাভ সত্ত্বেও না।'

কুরাইশরা এ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ রসদসামগ্রী সহ পাঁচ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের নির্মূল করতে এসেছিল। এই বাহিনীতে প্রায় তিন হাজার উষ্ট্র-সওয়ার, দু'শ ঘোড়সওয়ার ও সাত শ পদাতিক সৈন্য ছিল।

আরবদের লড়াইয়ে মেয়েরাও যোগ দিত। যাতে পুরুষেরা জান-প্রাণ দিয়ে লড়তে পারে। তাদের মনে এই ধারণা করজ করত যে, যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে মেয়েদের কাছে আমরা বেইজ্জতী হবো। এ যুদ্ধেও বহু সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করেছিল। এসব মহিলাদের সাথে সেই মহিলারাও ছিল, বদর যুদ্ধে যাদের আত্মীয়-পরিজনরা নিহত হয়েছিল। তারা এ মান্নতও করেছিল যে, তাদের হত্যাকারীদের রক্তপান করেই তবে তারা ক্ষান্ত হবে।

যুদ্ধারম্ভ

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হিন্দার নেতৃত্বে কুরাইশদের চৌদ্দজন মেয়ে দফ বাজিয়ে নেচে নেচে এক যুদ্ধসঙ্গীত গাইতে শুরু করল ঃ

'আমরা আরব দূর আকাশের চাঁদ-সিতারার মেয়ে।
আমরা চলি আকাশ গাঙে সোনার তরী বেয়ে।।
তোমরা যদি আগ বাড়িয়ে লড়াই করো
তোমরা যদি দুহাত দিয়ে শত্রু নিধন করো
তবেই তোমরা ধন্য হবে বক্ষে মোদের পেয়ে।
নইলে তোমরা হবে নরাধম সব অধমের চেয়ে।।'

এই নাচগান ও লজ্জা-জাগানো রাগ কুরাইশ বাহিনীর মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারা মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধের শুরুতেই মুসলমানদের পাল্লা ভারি হয়ে গেল। কুরাইশ বাহিনীর বহু সৈন্য ও লোকজন মারা পড়ল। কুরাইশ বাহিনী ময়দান ছেড়ে পালাতে লাগল। মুসলমানরা মনে করল যে, যুদ্ধে জয়লাভ আসন্ন। কিন্তু জয়লাভ সম্পন্ন হতে না হতেই তারা শত্রুদের ফেলে যাওয়া সম্পদ লুটতে শুরু করল। এদিকে সংকীর্ণ পাহাড়ি পথের দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনী তা দেখে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে সে স্থান ত্যাগ করে লুটের কাজে নেমে পড়ল।

www.nagorikpathagar.org

তাদের সেনাপতি হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর তাদের প্রাণপণ রোখার চেষ্টা করলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষেধবাণীও স্মরণ করিয়ে দিলেন কিন্তু কিছু লোক ছাড়া আর কাউকে রুখতে পারলেন না।

কুরাইশ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ তা দেখে ফেলল। এই সুযোগ সে কাজে লাগাল। এক পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করে এসে সে পিছন দিক দিয়ে আক্রমণ হানল। সংকীর্ণ ঐ পাহাড়ি পথের দায়িত্বে নিয়োজিত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর ও তাঁর সাথীরা কুরাইশদের এই ঝটিকা বাহিনীকে প্রাণপণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। কাফিরবাহিনীর হামলায় তারা শহীদ হলেন।

শত্রুরা পিছন থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিল। ওদিকে পলায়নপর শত্রুরাও ফিরে এলো। ফলে, দু'দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চলল।

এই হঠাৎ আক্রমণে মুসলমানরা হতচকিত হয়ে পড়লেন। মুসলমানরা পালাতে শুরু করলেন। এরই মধ্যে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য মুসলমানের হাতে বহু মুসলমান শহীদ হয়ে গেল। এই সুযোগে শত্রুরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ শুরু করল। আর এদিকে তিনি চীৎকার করে পলায়নরত মুসলমানদের ডাকতে লাগলেন ঃ 'আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আমার এদিকে এসো।'

কিন্তু প্রচণ্ড হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে তাঁর কথা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারল না। অবস্থা এমন হল যে, মাত্র ১২ সাহাবী তাঁকে প্রাণপণে রক্ষা করে যেতে লাগলেন।

এই সুযোগে আবদুল্লাহ বিন কুনাইয়া তাঁর পবিত্র চেহারার উপর তলোয়ার চালাল। সেই আঘাতে তাঁর বর্মের দুটি কড়ি তাঁর দেহের মধ্যে ঢুকে গেল। ইবনে হিশামের পাথরের আঘাতে তাঁর হাত জখম হয়ে গেল। উৎবার পাথরের আঘাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুটি দাঁত ভেঙে গেল। একবার তিনি পা পিছলে পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু এই ক'জনমাত্র সাথী তাঁকে রক্ষা করলেন। এই পড়ে যাওয়ার ফলেও তাঁর কিছুটা চোট লাগে। নিজেদের জীবনের বিনিময়েও নিজেদের নেতাকে এভাবে রক্ষা করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। হযরত মুসআব বিন উমাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু— যাঁর চেহারার সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার অনেক মিল ছিল—

www.nagorikpathagar.org

তাঁর শহীদ হওয়ার সাথে সাথেই গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করা হয়েছে।

এ খবররে অধিকাংশ মুসলমান হতচকিত হয়ে পড়লেন। এর দুরকম প্রভাব মুসলমানদের উপরে পড়ল। একদিকে হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু তরবারি ফেলে দিয়ে বললেন, এখন আর লড়াই করে কি হবে। খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এমন গভীর ভালোবাসা ছিল যে, তাঁর দৃষ্টিতে এসব আয়োজন বড়ই মূল্যহীন হয়ে পড়ল। উমর হতাশ হয়ে পড়লেন।

অন্যদিকে, ইবনে নজর (হযরত আনাস আনসারীর চাচা) একথা শুনে বললেন ঃ 'রসূলুল্লাহর পরে আমাদের বেঁচে থাকার আর কি মানে হয়?' এই কথা বলেই তিনি শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিছু সময়ের মধ্যে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। শাহাদতের পরে দেখা গেল তাঁর শরীরে আশিটির বেশি আঘাতের চিহ্ন।

আবার পরিস্থিতি বদলে গেল। প্রতিটি মুসলিম তরবারি হাতে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। সকলেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার জন্য অস্থির। সবার আগে কাব বিন মালিক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে ফেললেন এবং চীৎকার করে বললেন ঃ 'মুসলমান ভাইসব! আল্লাহর রসূল এখানে।' এ আওয়াজ যুদ্ধের ময়দানে বিদ্যুচ্চমকের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে সমস্ত মুসলমান যেন সম্বিত ফিরে পেল। তাদের সমস্ত অনুভূতিতে স্বর্গীয় প্রেরণার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। চারিদিক থেকে মুসলমানরা সেদিকে ছুটে আসতে লাগলেন। শত্রুদের আক্রমণ দুর্বল হয়ে পড়তেই তাঁরা পাহাড়ি চটিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আবু সুফিয়ান সদলবলে সেদিকে অগ্রসর হতেই সাহাবিরা পাথর নিক্ষেপ করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। শত্রুরা এই ভেবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, কোন রকমে আমরা জয়লাভ করলেও তার হাত থেকে আমরা নিস্তার পেলাম না। সেজন্য কুরাইশ সৈন্যরাও হতাশ হয়ে পড়ল।

আবু সুফিয়ান সামনের একটি পাহাড়ে উঠে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইল। সে উদ্দেশ্যে সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত উমর ও হযরত আবুবকর

www.nagorikpathagar.org

রাজিয়াল্লাহু আনহুমের নাম ধরে চীৎকার করে বলল ঃ 'কেউ আছে?' ওদিকে জেনে বুঝেই তার কথার জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকা হল। তখন সে বলল ঃ 'সব মরে গেছে।'

হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে জবাব দিলেন ঃ 'ওরে আল্লাহ্‌র দুশমন। আমরা সবাই সুস্থভাবে বেঁচে আছি।'

আবু সুফিয়ান চীৎকার করে বলল ঃ 'আয় হুবল। এখনো তারা মাথা উঁচু করছে।'

জবাব এলো ঃ 'আল্লাহর শক্তি সর্বত্রই সমান।'

আবু সুফিয়ান পুনরায় চীৎকার করে বলল ঃ 'আমাদের সাথে উজ্জা আছে, তোমাদের সাথে উজ্জা নেই।'

জবাব এলো ঃ 'আল্লাহ্ আমাদের সহায়। তোমাদের কোন সহায় নেই।'

এই যুদ্ধে ৭০ মুসলমান শাহাদত বরণ করেন এবং ৪০ ব্যক্তি আহত হন। অন্যদিকে শত্রুবাহিনীর ৩০ ব্যক্তি নিহত হয়।

উহুদ যুদ্ধের পরে

দু' একটি গোত্র বাদে আরবের প্রায় সমস্ত গোত্রই ইসলামের এই নয়া শক্তির অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পর এরা কিছুটা দমে গিয়েছিল। এরপরেই তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে, কিভাবে এর মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের পরে সমস্ত পরিস্থিতি বদলে যায় এবং আরবের ছোটবড় সমস্ত গোত্রই ইসলামের বিরুদ্ধে একই শক্তির পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়ে যায়। এরকম কিছু গোত্র ও তাদের কার্যকলাপ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হল ঃ

১. ৪ হিজরি সনের মুহররম মাসে কুত্‌ন এলাকায় তালহা বিন খুওয়াইলিদ ও সালমা বিন খুওয়াইলিদ বনু আসাদ বিন খুজাইমার নেতৃত্বে মদীনা অভিমুখে এক বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। এ খবর জানতে পেরেই প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সালমা মখজুমীর নেতৃত্বে তাদের মোকাবিলার জন্য দেড় শ' সৈন্যের এক বাহিনী পাঠিয়ে দেন। এঁরা কুত্‌ন পৌঁছালে শত্রুরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

২. এর পর ঐ মাসেই আসা নামক পাহাড়ি উপত্যকার এক গোত্রপতি নেহয়ান মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আনিস

www.nagorikpathagar.org

রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর নেতৃত্বে মুসলিমবাহিনী তাদের মোকাবিলায় রওনা হয়। তাদের সরদার সুফিয়ান এ অভিযানে নিহত হয় এবং হানাদার পৌত্তলিক বাহিনী পালিয়ে যায়।

৩. কুরাইশরা ষড়যন্ত্র করে আজল ও কারা গোত্রের সাত ব্যক্তিকে মদীনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করে। তারা তাঁকে গিয়ে বলল যে, আমাদের গোত্রগুলি ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। তাদের দ্বীনি শিক্ষা দানের জন্য কিছু ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠানো হোক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবী আসিম বিন সাবিত রাজিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে দশ সাহাবিকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। এই সাহাবিরা যখন সম্পূর্ণভাবে তাদের কবজায় এসে গেলেন তখন দু'শ পৌত্তলিক নও-জওয়ান তাদের জীবিতাবস্থায় গ্রেফতার করার জন্য এসে ঘিরে ফেলল। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে আট সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন এবং দুই বিশিষ্ট সাহাবি হযরত খুবাইব ও হযরত জায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে তারা ধরে নিয়ে গেল।

সুফিয়ান হাজলী মক্কায় নিয়ে গিয়ে এ দুই সাহাবীকে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দিল। হযরত খুবাইব উহুদের যুদ্ধে হারিস বিন আমীর নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। হারিসের পুত্র হযরত খুবাইবকে এই উদ্দেশ্য ক্রয় করল যে, সে তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেবে। হারিসের পুত্র তাঁকে কিছুদিন যাবৎ অনাহারে বন্দী করে রাখল।

এবার জালিমরা খুবাইব রাজিয়াল্লাহু আনহুকে ফাঁসীকাঠের নিচে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল ঃ 'যদি ইসলাম ত্যাগ করো, তাহলে আমরা তোমার জীবন ফিরিয়ে দিতে পারি।'

তিনি বললেন ঃ 'ইসলাম ত্যাগ করার পর বেঁচে থেকে আর লাভ কী'?'

এবার কাফিররা বলল ঃ 'তোমার শেষ ইচ্ছাটা ব্যক্ত করো।'

হযরত খুবাইব রাজিয়াল্লাহু আনহু দু'রাকাত নামায পড়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তাঁকে সে সময় দেওয়া হল। তিনি দু'-রাকাত নামায সম্পন্ন করলেন। তারপর হযরত খুবাইব রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ 'নামাযে যদি বেশি সময় ব্যয় করতাম তাহলে তোমরা বলতে মৃত্যুর ভয়ে সময় খাওয়াচ্ছে। সেজন্য সময়-সংক্ষেপ করলাম।'

তারপর জালিমরা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করল। তারপর তাঁর দেহের এক একটা অংশকে আলাদা করে ফেলল।

www.nagorikpathagar.org

এইভাবে হযরত জায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে সাফয়ান বিন উমাইয়া ক্রয় করে শহীদ করে দিল। আল্লাহু আকবর! এ দুই ব্যক্তির পবিত্র ইসলামের প্রতি কী গভীর ভালোবাসা আর অনুরাগ ছিল; কী গভীর নিষ্ঠা ছিল সদ্য প্রচারিত আল্লাহর হক ও দ্বীনের প্রতি! আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালে মুক্তির প্রতি কী গভীর বিশ্বাস আর ঈমান ছিল তাঁদের যে, জালিমদের সমস্ত অমানুষিক অত্যাচার শুধু আল্লাহর রাহে মুখ বুঁজে সয়ে গেলেন, সামান্য উফ্ পর্যন্ত করলেন না!

৪.৪ হিজরি সনের সফর মাসের ঘটনা। কিলাব গোত্রের নেতা আবু বরা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল যে, আমার গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত, আমার সাথে কিছু লোককে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে সত্তর সাহাবিকে পাঠিয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আসহাবে সুফ্ফা। রইস আমীর বিন নুফাইল এঁদের ঘিরে ফেলে হত্যা করল। এই অনভিপ্রেত ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরমে বড়ই আঘাত পেলেন। এর পর থেকে প্রতিদিন ফযর নামাযের শেষে তিনি সেই জালিমদের জন্য বদদোয়া করতে লাগলেন। এই সত্তর সাহাবির মধ্যে কেবলমাত্র একজন সাহাবী হযরত আমর বিন উমাইয়াকে সে এই বলে ছেড়ে দিয়েছিল যে, আমার মা এক ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য মান্নত করেছিল, সেই মান্নত পুরো করার উদ্দেশ্যে তোমাকে ছেড়ে দিলাম!

যখন আমর বিন উমাইয়া ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি পথে ঐ আমীরের গোত্রের দুই ব্যক্তিকে পেয়ে তাদের হত্যা করলেন এবং তিনি ভাবলেন, আমীর গোত্রের অত্যাচারের বিনিময়ে কিছু বদলা তো নিলাম।

প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন তখন তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি তার গোত্রের লোকেদের কথা দিয়েছিলেন এবং তা ছিল এর বিরোধী। অবশেষে তিনি এ দুই ব্যক্তির রক্তঋণ পরিশোধের কথা ঘোষণা করে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

দশম অধ্যায়
ইহুদিদের শয়তানী

মদীনার ইহুদিরা যদিও হিজরতের প্রথম বছরে মুসলমানদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল, তা সত্ত্বেও তাদের শয়তানী চরিত্রের মুখোশ উন্মোচিত হতে খুব বেশি দিন দেরি হল না। প্রতিশ্রুতি দানের দেড় বছরের মধ্যেই তাদের চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল।

মুসলমানরা যখন প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে বদর অভিমুখে প্রস্থান করেছিলেন, সে সময় এক মুসলিম মেয়ে বনী কায়নুকাদের মহল্লায় দুধ বেচতে গিয়েছিলেন। কিছু মহিলা তার সাথে শয়তানী আচরণ করল এবং লোকভর্তি বাজারে তাকে উলঙ্গ করে দিয়ে অপমান করল। মেয়েটির আর্ত-চীৎকার শুনে একজন মুসলমান সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি এক ইহুদিকে হত্যা করলেন। এবার সব ইহুদি একত্রিত হয়ে তাঁকে হত্যা করল এবং দাঙ্গাও বাধাল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইহুদিদের ডেকে এই দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারা সন্ধিচুক্তি মানতে অস্বীকার করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের এ জঘন্য আচরণ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পর্যায়ে চলে গেল। তারা পরাজিতও হল। শাস্তিস্বরূপ মদীনা থেকে উৎখাত করে তাদের খয়বরে নির্বাসন দেওয়া হল।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য মদীনার পৌত্তলিকদের কাছে পত্র পাঠিয়েছিল। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে তাদের সে চাল ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর বদরের যুদ্ধে পরাজয় বরণের পর এবার কুরাইশরা মদীনার ইহুদিদের কাছে পত্র লিখল যে– 'তোমরা জমিজায়গা ও দুর্গেরও মালিক। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করো নইলে আমরা তোমাদের সাথে এমন আচরণ করব যে, তোমাদের মেয়েদের শরীরে বস্ত্র পর্যন্ত থাকবে না।' এই পত্র পাওয়ার পর বনু নজীর গোত্র সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধোকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

০৪ হিজরি সনের কথা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বিশেষ প্রয়োজনে বনু-নজীরের মহল্লায় গেলেন। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি দেওয়ালের নিচে বসতে দিল। পরিকল্পনা ছিল ইবনে জাহহাশ দেওয়ালের উপরে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের মাথার উপর ভারি পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে খতম করে দেবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাদের এ শয়তানির কথা জানতে পেরে সেখান থেকে সহি-সালামতে চলে এলেন।

ইহুদিদের এ সব জঘন্য আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার বাধ্য হয়ে তাদের দুর্গ অবরোধ করলেন। এর ১৫ দিন পরে বনু নজীররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই মর্মে আবেদন করল যে, উটের পিঠে করে যত মাল-সামান নিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব তার অনুমতি দেওয়া হোক, আমরা এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাই। তাদের এ আবেদন মঞ্জুর হল। তারা ছ'শ উট বোঝাই মাল-সামান নিয়ে মদীনা ত্যাগ করে খয়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করল। যাওয়ার সময় তারা তাদের বাড়িঘর নিজ হাতে ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেল।

ইহুদিদের মধ্যে কাব বিন আশরাফ নামে এক কুখ্যাত কবি ছিল। সে বদরের যুদ্ধের সময় এমন সব উদ্দীপনা-সঞ্চারী কবিতা লিখেছিল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে আগুন লেগে গিয়েছিল। সে যুগে কবিতা খুব প্রভাব বিস্তারকারী মন্ত্র ছিল। তারপর সে মক্কায় গিয়ে বদরের যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে এমন সব জ্বালাময়ী কবিতা শোনাত যা শুনে তারা শোকাহত হয়ে বুক চাপড়াতি আর চীৎকার করে কাঁদত। তারপর সে মদীনায় ফিরে এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কবিতা শুনিয়ে জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত। সে তো একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে হত্যারও চক্রান্ত করেছিল। এসব অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন কীভাবে একে শায়েস্তা করা যায়। অবশেষে তাঁর অনুমতিক্রমে হযরত মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা কবি কাব বিন আশরাফকে ৩ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

শত্রুদের চালবাজি

মদীনার অভ্যন্তরের গুপ্তশত্রুদের শায়েস্তা করার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু স্বস্তিতে থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু শত্রুরা

www.nagorikpathagar.org

তা-ও থাকতে দিল না। মদীনার বাইরে গিয়ে বসবাসরত ইহুদিরা আরব পৌত্তলিকদের সাথে, বিশেষ করে কুরাইশদের সাথে যোগসাজশে মুসলমানদের নির্মূল করার উপায় খুঁজতে লাগল। পরিণামস্বরূপ সমস্ত ইসলামবিরোধী শক্তি একত্রিত হয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

১. আবু সুফিয়ান উহুদের ময়দানে কৃত ঘোষণা মোতাবেক দু'হাজার পদাতিক ও ৫০ ঘোড়সওয়ারের এক বাহিনী নিয়ে আক্রমণের জন্য রওনা দিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খবর পাওয়া মাত্র ১,৫০০ পদাতিক ও দশ ঘোড়সওয়ারের এক বাহিনী নিয়ে তার মোকাবিলায় প্রস্থান করে বদর পৌঁছালেন। সেখানে শিবির স্থাপন করে কুরাইশ বাহিনীর আগমনের জন্য তিনি আটদিন যাবৎ অবস্থান করলেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে জহরান বা আসফান নামক স্থান পর্যন্ত এসে এই বলে ফিরে গেল যে, শুকনো মওসুম ছাড়া এ বছরটা যুদ্ধের ঠিক উপযুক্ত নয়। অবশেষে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের ফিরে যাবার খবর শুনে নিজেও মদীনায় ফিরে এলেন।

২. ০৪ হিজরি সনের মুহররম মাসে বনী গাতফানদের কিছু গোত্র, বনী মুহারিব ও বনী সালবার লোকেদের যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর এলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারশ রেজাকারের[১] এক বাহিনী নিয়ে মোকাবিলার উদ্দেশে রওনা হলেন। মোকাবিলার জন্য, সেই সাথে সেখানে এক বাহিনী মজুত ছিল। কিন্তু অবশেষে যুদ্ধ হয়নি।

সেই সময়ে আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল। গাওরস নামক এক পৌত্তলিক তার সম্প্রদায়ের লোকেদের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে কোনোভাবে মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে হত্যা করে আসবে। সে যখন উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে এলো, তখন তিনি একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর তলোয়ারটি গাছের ডালে টাঙানো ছিল। গাওরস তলোয়ার টেনে নিয়ে আক্রোশভরে বলল ঃ 'বলো, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে বললেন ঃ 'আল্লাহ্ আমার রক্ষাকর্তা।'

৩. দওমাতুল জুন্দল নামক স্থানটি ছিল এক প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে সবসময়েই লোকের ভীড় জমে থাকত। ইহুদি ও খ্রিস্টান

---

১. স্বেচ্ছাসেবক বা দেশপ্রেমিক বাহিনী। ধর্ম, দেশ ও জাতির জন্য যাঁরা নিবেদিত প্রাণ।

www.nagorikpathagar.org

ধর্মপ্রচারকরা এখানে তাদের ধর্মের বাণী প্রচার করত। বনু নজীররা খয়বর ইত্যাদি স্থানে যাওয়া-আসার পথে এখানে এসে অবস্থান করত। দেখতে দেখতে এ স্থানটি প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের এক আখড়ায় পরিণত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে মক্কায় কুরাইশ ও খয়বরের ইহুদিদের যোগসাজশে খ্রিস্টান সরদার উকাদরের নেতৃত্বে মদীনা আক্রমণের এক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, দওমাতুল জন্দল-এ শত্রুরা মদীনা আক্রমণের জন্য একত্রিত হয়েছে। ১৫ হিজরি সনের রবীউল আউয়াল মাসে তিনি এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন। দওমাতুল জুন্দলে অবস্থানরত শত্রুবাহিনী মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

৪. এবার বনু মুস্তালিকদের পক্ষ থেকে হামলার প্রস্তুতির খবর এলো। বুরাইদা আসলামীকে পাঠিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হল। জানা গেল ঘটনা সত্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ০৫ হিজরি সনের ৩ শাবান তারিখে অভিযান প্রেরণ করলেন। বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয়ে মরীসীআ-য় (পানির ঝরনা) গিয়ে পৌঁছাল। বনী মুস্তালিকের সরদার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অকস্মাৎ আগমনে তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। কেবলমাত্র তার গোত্রের লোকেরা অবশিষ্ট রইল। প্রথম আক্রমণেই হারিসের দল পরাজিত হল। গনীমতের মালের মধ্যে প্রচুর চতুষ্পদ প্রাণী হাতে এসে গেল এবং পরাজিত বাহিনীকে বন্দী করা হল। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে (হযরত) জুওয়াইরিয়াও ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্মতিতে তাঁকে বিয়ে করলেন। এর পরিণতি এই হল যে, মুসলমানরা সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে এই বলে মুক্তি দিলেন যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজনদের আমরা আর বন্দী করে রাখতে পারি না।

আহজাবের যুদ্ধ

উহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা দৈবক্রমে জয়ের মুখ দেখেছিল কিন্তু পূর্ণ জয়লাভ করতে পারেনি; তা সত্ত্বেও তারা বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াত বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি; কিন্তু তবুও তারা অন্তরে জানত এবং একথা স্বীকারও করে নিয়েছিল যে, বাস্তবিকই তারা উহুদের যুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি; এবং মুসলমানরা ইস্পাতের মতো কঠিন। তাদের পরাজিত করে

www.nagorikpathagar.org

নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্র মদীনা জয় করা অত সহজ কথা নয়। আগামী বছরে আরো বেশি প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বড় আকারের আক্রমণ শানানোর কথা ঘোষণা করে তারা উহুদ ত্যাগ করেছিল। সে ঘোষণা আবু সুফিয়ান করেও ছিল কিন্তু মক্কা থেকে রওনা হওয়ার পর পরিস্থিতি তার পক্ষে নয় বিবেচনা করে সে মক্কায় ফিরে গিয়েছিল।

সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে কুরাইশরা বুঝে গিয়েছিল যে, তাদের একার পক্ষে আর মদীনা জয় করা সম্ভব নয়; কিন্তু মুসলমানদের অন্য শত্রুরা যেমন ইহুদি ও অন্যান্য শত্রুরা সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণের একটা পরিকল্পনা রচনা করল।

এইভাবে প্রস্তুতির পর ০৫ হিজরি সনের জীকাদা মাসে ইহুদি, কুরাইশ, পৌত্তলিক ও অন্যান্য ইসলাম-বিরোধী শত্রুদের সমন্বয়ে গড়া দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনা অভিমুখে রওনা হল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার এ প্রস্তুতির খবর দওমাতুল জুন্দলে সফরের সময়েই পেয়েছিলেন। এই আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি সেখান থেকে অতি দ্রুত মদীনায় ফিরেও এসেছিলেন। পরামর্শ হল, মদীনার অভ্যন্তরে থেকে মোকাবিলা করা হবে, না শহরের বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করা হবে? হযরত সালমান ফারসীর এই পরামর্শ গ্রহণ করা হল যে, ইরানের মতো পরিখা খনন করে শত্রুদের মোকাবিলা করা হবে।

তিন হাজার মুসলিম রাজাকারের পবিত্র হাত পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত হল। যে হাত জেহাদের পবিত্র কাজে এতদিন নিয়োজত ছিল, সেই উদ্দেশ্যেই তা এখন পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত হল। দশ জন করে ব্যক্তিকে ২০ গজ করে খননের কাজে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিয়োজিত করা হল। পরিখার বিস্তৃতি সর্বোচ্চ কুড়ি গজ ও সঙ্কীর্ণতায় সর্বোচ্চ পাঁচ গজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হল। সব মিলিয়ে তার দৈর্ঘ্য ছিল তিন মাইল।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তিন সপ্তাহ সময়কালের মধ্যে মুসলমান রাজাকাররা প্রায় ৩ লক্ষ ৮ হাজার ঘন গজ মাটি খনন করেন– এ বড় সহজ কাজ নয়। প্রতি ব্যক্তি পিছু এক শ'র বেশি ঘন গজ মাটি আসে। মাট খননের উপকরণও ছিল যথেষ্ট অপর্যাপ্ত– যা বনু কুরাইজাদের পক্ষ থেকে আসে তাদের সাথে সন্ধি-মোতাবেক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ হযরত আবুবকর ও হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতো ব্যক্তিরাও এ কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিখা খনন করতে, পাথর ভাঙতে ও মাটি সরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অংশগ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করে সবাইকে সমানে প্রেরণা যুগিয়ে গেলেন। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একবার এমন এক পাথর বেরিয়ে এলো যে, কেউ তা ভাঙতে সমর্থ হল না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে কোদাল দিয়ে এমন করে আঘাত করলেন যে, তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

এদিকে পরিখা খননের কাজ শেষ হয়ে গেল ওদিক থেকে ০৫ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে মক্কা থেকে শত্রুরা পঙ্গপালের মতো ছুটে এলো। শত্রুদের এ বিশাল বাহিনী বিপুল উৎসাহে মদীনা আক্রমণ করতে এসে পরিখা দেখে হয়রান হয়ে পড়ল। তাদের এ অপবিত্র আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলল। তারা ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়ে পরিখার তীর পর্যন্ত আসে আর লাচার হয়ে ফিরে যায়। এবার তারা লাফ দিয়ে দিয়ে পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু পরিখার মধ্যে পড়ে গিয়ে নিজেদেরই বাহনের চাপে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘাট পেরিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে তাদের বহুসংখ্যক লোক নিহত হল কিন্তু পরিখা অতিক্রম করতে পারল না। এদিকে মুসলমানদের মজবুত তীরন্দাজ বাহিনী তীর তাক করে বসে রইল, শত্রুরা পরিখা পার হওয়ার চেষ্ট করতেই তীর নিক্ষেপ করে তাদের ফিরিয়ে দিতে লাগল।

মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যায় তিন হাজার; কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এমন করে মোতায়েন করেছিলেন যে, তাদের সামনে ছিল পরিখা আর পিছনে ছিল সালাআ পাহাড়। চৌকিগুলিতে নজরদারি এত কঠোর ছিল যে, তাদের ফাঁকি দিয়ে শত্রুরা বিন্দুমাত্রও সাফল্যের মুখ দেখতে পেলো না। এ যুদ্ধে তলোয়ার ও বর্শা ছিল একেবারেই বেকার। শুধুমাত্র তীরই ছিল দু'পক্ষের প্রধান ভরসা। ফলে দু'পক্ষ থেকেই তীর বর্ষণ চলছিল। কিছুদিন যাবৎ শত্রুরা খুব আস্ফালন করল, বিভিন্ন জায়গা থেকে আক্রমণ হানার চেষ্টা করল কিন্তু সাফল্যের মুখ দেখতে পেলো না।

দীর্ঘদিন ধরে অবরুদ্ধ থাকার ফলে মুসলমানরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ওদিকেও শত্রুদের অবস্থাও মোটেই ভালো ছিল না। শত্রুরা শলাপরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ বনু কুরাইজাকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া যেতে পারে। আবু সুফিয়ানের অনুরোধে শত্রুপক্ষ থেকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করল হুই বিন আখতাব। সে বনী কুরাইজার সরদার কাব বিন উসাইদের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলল এবং তাকে অনেক লোভও দেখাল, সেইসাথে প্রিয়নবীর পক্ষ থেকে ভয়। সে প্রথমেই তা মানতে অস্বীকার করে বলল,

এখনো পর্যন্ত মুহাম্মাদ আমাদের সাথে কখনোই চুক্তির খেলাপ করেননি; সেজন্য আমি তা পারব না। কিন্তু তাকে বোঝানো হল যে, চুক্তির খেলাপ করা তাঁর জন্য সামান্য মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। এসব নানা কথার ফাঁদে পড়ে কাব বিন উসাইদ সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করতে রাজি হয়ে গেল।

সাথে সাথে এ খবর মুসলমানদের কাছেও পৌঁছে গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদন্ত করে জানতে পারলেন যে, একথা ঠিক। সাথে সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র জবান হতে উচ্চারণ করলেনঃ 'আল্লাহু আকবর, হুসবুন আল্লাহু নেয়ামুল উকীল।'

মদীনায় মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করছিলেন। কবে অবরোধ উঠবে তারও ঠিক নেই। এদিকে দিনের পর দিন ধরে অনিদ্রা অনাহারে মুসলমানরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে নানা বাহানায় মুনাফিকদের পৃথক হয়ে যাওয়া, এই দুরবস্থার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কখনো-কখনো নামায কাজা হওয়ার উপক্রম হতে লাগল। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করা অত সহজ ব্যাপার ছিল না। এদিকে বনী কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতায় শহরের মধ্য দিয়ে বারুদি-সুড়ঙ্গ পেয়ে গেল শত্রুরা– যা পিছন দিয়ে ছুরি মারার শামিল– এসব বিপদ একসাথে ঘনিয়ে এলো মুসলমানদের মাথার উপর। আজ একথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে, এই শত্রুদের মোকাবিলায় মাত্র তিন হাজার জানিসার কোন বীরত্ব আর কোন শৌর্যের পরিচয় দিয়ে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছিলেন?

এদিকে অবরোধ যত প্রলম্বিত হচ্ছিল, আক্রমণকারী শত্রুদের অবস্থাও তত শোচনীয় হয়ে পড়ছিল। দশ হাজার সৈন্যের নিয়মিত পানাহারের ব্যবস্থা করা মোটেও সহজ ব্যাপার ছিল না। এদিকে প্রচণ্ড শীত। আর ইতিমধ্যে এমন ঝড়-তুফান বয়ে গেল যে, শত্রুরা ত্রাহি ত্রাহি রব তুলে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এ কিসের হাওয়া? নিঃসন্দেহে আল্লাহর, তা আল্লাহর গজব ছাড়া আর কিছু ছিল না। আল্লাহর তরফ থেকে তা মুসলমানদের জন্য করুণা আর কাফির শত্রুদের বিরুদ্ধে আযাব স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিল।

বনু কুরাইজার পরিণাম

আহজাবের যুদ্ধের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার বনু কুরাইজাকে এই বলে ডেকে পাঠালেন যে, আহজাবের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সমূলে নির্মূল করবার জন্য তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে যে জঘন্য অপরাধ করেছিলে এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করো। বনু কুরাইজা তো ইতিপূর্বে প্রমাণও করে দিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রু ছাড়া আর কিছু নয়। এবার তারা তা প্রকাশ্যেও জানিয়ে দিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পরিবর্তিত চেহারা দেখে তারা দুর্গমধ্যে আশ্রয় নিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করল।

সে সময় মুসলমানরা জানতে পেরেছিলেন যে, বনু নজীরের সরদার হুয়াই বিন আখতাব, যে বনু কুরাইজাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল, সে ঐ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে।

বনু কুরাইজাদের বিশ্বাসঘাতকতা এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে তারা বদরের যুদ্ধে হানাদার কুরাইশ বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল; কিন্তু করুণার প্রতিমূর্তি প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেবার তাদের এ অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছিলেন।

এবার তারা দুর্গমধ্যে আশ্রয় নেওয়ায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হল। জিলহজ্জ্ব মাসে দুর্গ অবরোধ করা হল। এ অবরোধ ২৫ দিন পর্যন্ত চলল। কঠোর অবরোধের ফলে বনু কুরাইজারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা এবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন মুসলমানকে মধ্যস্থতাকারীরূপে এই বলে পাঠাল যে, আউস গোত্রের নেতা সাদ বিন মুয়াজকে বিচারক নিযুক্ত করে আমাদের ব্যাপারটা তাঁর উপরেই সোপর্দ করা হোক। তিনি যা রায় দেবেন, আমরা তা মাথা পেতে নেবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মেনে নিলেন।

বনু কুরাইজারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো এবং সাদ বিন মুআজের উপর মামলা নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হল। আল্লাহ জানেন, কি মনে করে আর কি আশায় তাদের মামলা-নিষ্পত্তির ভার ইহুদিরা সাদ বিন মুআজের উপর অর্পণ করেছিল। সাদ বিন মুআজ সাক্ষী-সাবুদ-সাপেক্ষে নিশ্চিত হয়ে মামলার যে রায় দিলেন, তা নিম্নরূপ ঃ

১. বনু কুরাইজার যুদ্ধক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হোক।

২. মহিলা ও শিশুদের দাস বানানো হোক, এবং

৩. তাদের সহায়-সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া হোক।

এ ফায়সালা প্রসঙ্গে একথা স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, এ বিচার সম্পন্ন হয়েছিল ইহুদিদেরই নির্বাচিত বিচারকের হাতে। ইহুদিরা তাদের শরীয়তমতে, তাদের শত্রুদেরও ঠিক এই শাস্তিই দিত; বরং তাদের শরীয়ত মতে এর চেয়েও শক্ত শাস্তি প্রদান করা হত।

www.nagorikpathagar.org

একাদশ অধ্যায়

হুদাইবিয়ার সন্ধি

কাবা ছিল মুসলমানদের আসল কেন্দ্রভূমি। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে এটি নির্মাণ করেছিলেন। মুসলমানরা ছয় বছর আগে তাঁদের এই কেন্দ্রভূমি থেকে চলে গিয়েছিলেন। এই কেন্দ্রভূমির সাথে সম্পর্কিত রয়েছে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হজ্ব। সেজন্য কাবা-গৃহে গিয়ে হজ্ব সম্পন্ন করার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত ছিলেন তাঁরা।

এমনিতেই আরবরা সারা বছর ধরে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত কিন্তু হজ্ব উপলক্ষে তারা চার মাস যাবৎ যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। যাতে লোকেরা বিনা বাধায় সেখানে গিয়ে হজ্ব সমাপন করে যার সেই নিরাপদ স্থানে আবার ফিরে যেতে পারে। বহুকাল ধরেই তাদের এই রীতি চলমান ছিল।

০৭ হিজরি সনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের এক স্বপ্নের কথা শোনালেন। বললেন, আমি যেন দেখলাম, আমার মুসলমান সাথীদের নিয়ে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ (আল্লাহ্‌র ঘর) তাওয়াফ করছি।

এই স্বপ্নের কথা শুনে বিশেষ করে মুহাজির মুসলমানরা, মক্কা ছিল যাঁদের মাতৃভূমি, তাঁরা মাতৃভূমিতে গিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন; সেই সাথে সাধারণ মুসলমান যাঁরা, তাঁরাও সেখানে যাওয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা সফরের জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন। মদীনা থেকে মুসলমানরা যুদ্ধের সরঞ্জাম সাথে করে নিলেন না। কেবলমাত্র কুরবানীর পশু নিয়ে যাত্রা করলেন। যাত্রা শুরু হল জীকাদা মাসে। যে মাসে আরবের পুরাতন রীতি অনুযায়ী যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই যাতে নির্বিঘ্নে মক্কায় এসে হজ্ব করে যেতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৪০০ মুসলমান সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

জুলহুজাইফা নামক স্থানে কুরবানীর প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নীতিনির্দেশ পালন করা হল। সেই সাথে এ কথাও ঘোষণা করে দেওয়া হল যে, মুসলমানদের ইচ্ছা কেবলমাত্র কাবার জিয়ারত, কোনো প্রকারের যুদ্ধবিগ্রহ

www.nagorikpathagar.org

নয়। এবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীকে মক্কায় পাঠালেন এ খবর তাদের জানাতে এবং তাদের কী মনোভাব তা জেনে আসতে। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে খবর দিলেন, কুরাইশরা সমস্ত পৌত্তলিক গোত্রকে একত্রিত করে জানিয়ে দিয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না; সেজন্য তারা মক্কার বাইরে সশস্ত্র সেনা মোতায়েন করছে।

এ সংবাদ পাওয়ার পরেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে অগ্রসর হতে হতে হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করলেন। মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে হুদাইবিয়া নামে একটি কুঁয়া আছে। কুঁয়ার নামের সাথে ঐ গ্রামের নামটি জুড়ে গিয়ে হুদাইবিয়া নাম ধারণ করেছে। এখানে খুজাআ গোত্রের সরদার প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে জানালেন ঃ 'কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি ওদের গিয়ে বলে দাও, আমরা কেবল উমরাহ্ পালনের জন্য এসেছি; যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নয়। আমাদের কাবার জিয়ারত ও তওয়াফ করার সুযোগ দেওয়া উচিত।'

এ খবর যখন কুরাইশদের কাছে পৌঁছে গেল তখন কিছু দুষ্ট লোক বলল ঃ 'মুহম্মদের কথা শোনার কোনো প্রয়োজন আমরা বোধ করি না।' কিন্তু বোধবুদ্ধিওয়ালা কিছু লোকের মধ্য থেকে উরওয়া নামক এক ব্যক্তি বলল ঃ 'এ ব্যাপারটির ফায়সালা করার দায়িত্ব আমাকে দাও। আমি মুহম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে গিয়ে কথা বলে আসি, দেখি কী হয়।'

উরওয়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলল ঃ কিন্তু মামলা নিষ্পত্তি হল না।

ইতিমধ্যে কুরাইশদের কিছু লোক মুসলমানদের উপর হামলা করতে এলে তাদের গ্রেফতার করা হল।

এবার সিদ্ধান্ত হল যে, সমঝোতার জন্য হযরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় পাঠানো হোক। হযরত উসমান মক্কায় গেলেন কিন্তু কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কিছুতেই মুসলমানদের কাবা জিয়ারত করতে দিতে রাজি হল না ঃ উল্টে হযরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুকে তারা বন্দী করল।

www.nagorikpathagar.org

এখানে মুসলমানদের কাছে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।

এ খবর মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।' একথা বলে তিনি বাবলা গাছের ছায়ার নীচে গিয়ে বসলেন। এখানে এসে সাহাবীরা একে একে তাঁর হাতে হাত রেখে প্রতিশোধের শপথ গ্রহণ করতে লাগলেন। পবিত্র কুরআনে তা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

'আল্লাহ সেই মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট, যারা গাছের নীচে তোমার হাতে (হাত রেখে) শপথ গ্রহণ করছিল।'

শপথের বাণী ছিল এ রকম ঃ 'শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে লড়াই করবো; যতক্ষণ পর্যন্ত উসমান হত্যার প্রতিশোধ সম্পূর্ণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ থেকে বিরত হব না।'

এই শপথের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বাম হাতকে উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর ডান হাত বলে ধরে নিজের ডান হাতটি এগিয়ে দিয়ে সাথীদের সেই হাতে শপথ করালেন। এই বাইয়াতের প্রস্তুতির খবরে কুরাইশরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল এবং তাদের সরদাররা একে একে হুদাইবিয়ায় এসে হাজির হতে লাগল।

উরওয়া বিন মাসউদ, যিনি কুরাইশদের পক্ষ থেকে এসেছিলেন, তিনি ফিরে গিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বললেন ঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর, রোমের বাদশাহ কায়সার-এর ও ইরানের বাদশা কিসরার দরবারে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে কিন্তু এমন বাদশাহ কোথাও দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি যেমন দেখেছি মুহাম্মাদকে, সাথীদের সহ তাঁর দরবারে। নেতার প্রতি তাঁর সাথীদের হৃদয়ে যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তা আর কোথাও দেখিনি। মুহাম্মাদ থুথু ফেললে মাটিতে পড়ার আগে তা তাঁর সাথীরা ধরে নিয়ে নিজেদের গায়ে মেখে নেয়।

মুহাম্মাদ যখন কোনো হুকুম করেন, তখন তা তামিল করার জন্য আনুগত্যের প্রতিযোগিতা শুরু হয়, যখন তিনি ওজু করেন, সেই ওজুর পানির জন্যও এরকমই হয়, যেন লড়াই শুরু হয়ে গেছে। যখন তিনি কালাম পড়েন, তখন সবাই নিশ্চুপ ও নীরব হয়ে যায়। মুহম্মদের প্রতি তাদের এতটাই আনুগত্য যে, তারা তাঁর সামনে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকায় না। আমার অনুরোধ যেভাবেই হোক, তাঁর সাথে মিটিয়ে নাও।'

www.nagorikpathagar.org

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর কুরাইশরা সন্ধি-চুক্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সুহাইল বিন আমরকে প্রতিনিধি করে পাঠাল সমঝোতা-চুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে।

দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আলাপালোচনার পর চুক্তির শর্ত নির্ধারিত হয়ে গেল। তা নিম্নরূপ ঃ

মুসলমানরা এ বছর ফিরে যাবেন।

পরবর্তী বছরে আসবেন এবং কেবলমাত্র তিন দিন অবস্থানের পর ফিরে যাবেন।

যুদ্ধের সরঞ্জাম সাথে করে আনা যাবে না। কেবলমাত্র তলোয়ার আনা যাবে। তবে তা খাপে থাকবে। বের করা যাবে না।

মক্কায় যে মুসলমানরা আজো অবস্থান করছেন, তাদের স্থানান্তর করা যাবে না; তবে কোনো মুসলমান মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে বাধা দেওয়া যাবে না; এবং তাদের ফিরে যেতে দেওয়া হবে না।

আরবের গোত্রগুলির মুসলমান অথবা কাফের যে কারো সাথে সমঝোতা করার অধিকার থাকবে।

এই সন্ধিচুক্তি দশ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

পাঁচ সংখ্যক শর্ত শুনে হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু আপত্তি করলেন। হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু সবচেয়ে বেশি আপত্তি করলেন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন এবং বললেন ঃ 'এ শর্তও মঞ্জুর।'

চুক্তিপত্র লিখছিলেন হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু। তিনি শুরুতেই লেখেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।'

কুরাইশ পক্ষের প্রতিনিধি সুহাইল এর তীব্র বিরোধিতা করে বলল ঃ 'আল্লাহর কসম! রহমান কাকে বলে আমরা জানিনা। লিখুন 'বিসমিল্লাহুম্মা'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই লেখার নির্দেশ দিলেন।

হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু এবার লিখলেন ঃ 'এই চুক্তিপত্র মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কুরাইশদের মধ্যে সম্পাদিত হল।

সুহাইল এতেও আপত্তি করল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লেখা হল।

হযরত আবু জান্দালের প্রসঙ্গ

হুদাইবিয়ার সন্ধির পঞ্চম সংখ্যক শর্তের ব্যাপারে কুরাইশদের ধারণা ছিল যে, এই শর্তের ভয়ে কেউ আর ইসলাম গ্রহণ করবে না। কিন্তু শর্ত

www.nagorikpathagar.org

তখনো লেখা চলছিল, দু'পক্ষের তরফ থেকে তখনো স্বাক্ষর হয়নি; এমন সময় সুহাইল বিন আমরের (যে মক্কার পক্ষ থেকে চুক্তি করতে এসেছিল এবং স্বাক্ষরের দায়িত্ব ছিল তার উপর) সামনে আবু জান্দাল মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় পৌঁছে গেল। সে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কুরাইশরা তাকে বন্দী করে রেখেছিল।

আবু জান্দাল বলল ঃ 'আমাকে আশ্রয় দিন।'

সুহাইল আপত্তি করল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এখনো চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ হয়নি, সেহেতু চুক্তির শর্ত তার উপর কার্যকর হতে পারে না।'

সুহাইল বলল ঃ 'তাহলে আমরা চুক্তি করব না।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় ব্যথিত চিত্তে তার কথা মেনে নিলেন এবং আবু জান্দালকে তার হাতে সোপর্দ করলেন।

কুরাইশরা মুসলমানদের সামনেই তাকে বন্দী করে হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে তাকে নিয়ে গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ 'আবু জান্দাল! ভয় পেও না। অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।'

আবু জান্দালের আর্তনাদ ও কুরাইশদের জুলুম দেখে মুসলমানরা দুঃখ ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে উঠলেন। এমন কি হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'আপনি তো আল্লাহর সত্য নবী। তা সত্ত্বেও এ আর্তনাদ আমরা কী করে সহ্য করব? 'কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমি আল্লাহর রসূল। তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারি না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।'

অবশেষে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর হল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আবু জান্দালের দাবি ত্যাগ করতে হল। এইভাবে মুসলমানরাও ইসলামের স্বার্থে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ কঠোরভাবে মেনে নিলেন।

প্রকাশ্য বিজয়

এই সন্ধিচুক্তিকে পবিত্র কুরআনে প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এই চুক্তির বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক বড়-বড় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল ঃ

১. এই চুক্তির ফলে মুসলমান ও মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে সমস্ত রকমের মেলামেশার পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। লোকেদের যাতায়াত শুরু হয়ে

www.nagorikpathagar.org

গেল। বহুকাল যাবৎ বিচ্ছেদের পর আত্মীয়-স্বজনরা আবার একত্রিত হবার সুযোগ পেল। মক্কায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে যেসব ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল, মুসলমানরা খোলাখুলি তার জবাব দিয়ে সে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে দিলেন। এমন কি এর ফলে হক ও ইসলামের আহ্বান মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল এবং প্রকাশ্যে পরচর্চা হতে লাগল। এইভাবে সারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার এক বাতাবরণ সৃষ্টি হল। হুদাইবিয়ার সন্ধির দু'বছরের মধ্যে যে সুফল লাভ হল, তা ছিল বিগত আঠারো-উনিশ বছরের সাফল্যের সমান। এমন কি এই সন্ধির পরে খালিদের মতো সেনাপতি ও আমর বিন আসের মতো বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছিলেন।

২. এই চুক্তির দ্বিতীয় সুফল এই যে, আপাতত যুদ্ধের কবল থেকে রেহাই পেয়ে মুসলমানরা মনে-প্রাণে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং আল্লাহর ধ্যানে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে নিজেদের ইসলামী রাষ্ট্রকে আরো সুগঠিত ও সুসংহত করে গড়ে তোলার সুযোগ পেলেন।

৩. তৃতীয়ত, ইসলামের আহ্বান বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় এই চুক্তির পরে (এর প্রসঙ্গ পরে উল্লেখিত হবে)।

৪. চতুর্থত, এই চুক্তির ফলে মুসলমানরা খয়বরের যুদ্ধে কুরাইশদের বিরোধিতা থেকে একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। এমন কি, হুদাইবিরয়ার সন্ধির পরে পাকাপাকিভাবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসে গেল।

৫. পঞ্চমত, আরবের গোত্রগুলি কুরাইশদের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল এই মর্মে যে, মদীনার নেতৃত্বকে তারা মেনেও নিতে পারবে আবার সহযোগিতাও করতে পারবে। এর ফলে যে কেউ ইচ্ছা করলে মুসলমানদের সাহায্য ও সহযোগিতার সুযোগ পেয়ে গেল; সেজন্য তারা কুরাইশদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য ছিল না। ঠিক সে সময়েই বনু খুজাআ গোত্র মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

৬. ষষ্ঠত, মুসলমানরা এক বছর পরেই ঠাট-বাটের সাথে কাবার জিয়ারতে মক্কায় গিয়ে পৌছালেন এবং কুরআনের আইন মোতাবেক 'লা তাওয়াফুন' এর মন্ত্র দিগ্-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল।

৭. সপ্তমত, সন্ধিচুক্তির পঞ্চম ধারাটি খোদ কুরাইশদের গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে গেল। আবু জুন্দাল ও আবু বশীর প্রমুখ নির্যাতিত মুসলমানরা শক্তি সঞ্চয় করে কুরাইশদের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন।

এসব কারণে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বাদশ অধ্যায়

খয়বরের যুদ্ধ

মদীনা থেকে সিরিয়া অভিমুখে তিন মনজিল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গার নাম খয়বর। এ ছিল একান্তভাবে ইহুদীদের বসবাসের একটি স্থান। তারা এর চারিদিকে মজবুত দুর্গ নির্মাণ করে রেখেছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খায়বরে পৌঁছানোর কিছুদিন পরেই (এক মাসেরও কম সময়) মুসলমানরা জানতে পারেন যে, খয়বরের ইহুদিরা আহজাবের যুদ্ধের বদলা নিতে ও সে যুদ্ধে হারানো মান-সম্মান পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এক জবরদস্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য তাদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করা।

তারা গাতফান গোত্রের চার হাজার লড়াকু যুবককে নিজেদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করল।

তারা এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, মদীনা বিজয়ের পর খয়বরের উৎপাদনের অর্ধেক ভাগ গাতফানদের নিয়মিতভাবে প্রদান করা হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যুদ্ধে কেবলমাত্র তাঁদেরই সাথে নিয়েছিলেন যাঁরা 'বায়তুররেজোয়ান'-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল চৌদ্দ শ। দু'শ ঘোড়সওয়ার ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

এ বাহিনীর সম্মুখভাগের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত উকাশা বিন মিসন আসাদী রাজিয়াল্লাহু আনহু এবং ডান পাশের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত উমর বিন খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহু এবং বাম পাশের নেতৃত্বে ছিলেন অন্য কোনো সাহাবী।

২০ মহিলা-সাহাবীও এতে অংশ নিয়েছিলেন, যাঁরা অসুস্থ ও যুদ্ধাহত সৈনিকদের সেবার জন্য এসেছিলেন। ইসলামী ফৌজ রাতের বেলায় খয়বরের নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর-নীতি ছিল রাতের বেলায় কখনো যুদ্ধ শুরু না করা, এবং কোনো মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর না করা। সেজন্য ইসলামী বাহিনী ময়দানে শিবির স্থাপন করল। যুদ্ধের জন্য এই স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন বীর সাহাবি হযরত হুবাব বিন মুনজির রাজিয়াল্লাহু আনহু। এই ময়দানটি আহলে খায়বর ও বনু গাতফানদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

www.nagorikpathagar.org

এই ব্যবস্থার ফলে বনু গাতফানরা খয়বরের ইহুদিদের কোনো রকমের সাহায্য-সহযোগিতার সুযোগ পেলনা। যখনই তারা তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছে, তখনই ইসলামী ফৌজের বাধাদানের ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

হযরত উসমান বিন আফফান রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর এই শিবিরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

মাহমুদ বিন মুসলিমা রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহুকে আক্রমণকারী বাহিনীর নেতৃত্বে রাখা হল। তিনি নুতাব দুর্গে আক্রমণ শুরু করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ বাহিনীতে অংশগ্রহণ করলেন। অবশিষ্ট সেনা-শিবিরের দায়িত্ব পালন করলেন হযরত উসমান বিন আফফান রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহু।

মাহমুদ বিন মুসলিমা রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহু পাঁচ দিন ধরে অনবরত আক্রমণ চালিয়েও কেল্লা ফতে (দুর্গ জয়) করতে পারলেন না। পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনের মাথায় মাহমুদ রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড গরমে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য দুর্গের বাম দিকের দেওয়ালের ছায়ায় শুয়ে পড়েছিলেন। কানানা বিন হাকিক নামক এক ইহুদি এই সুযোগে তাঁর মাথায় একখানি পাথর ছুঁড়ে মারলে সেই আঘাতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। সাথে সাথে মাহমুদ বিন মুসলিমা রাজিয়াল্লাহু আনহুর ভাই মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা মুসলিম বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত বড়ই বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন। মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা নির্দেশ দিলেন ইহুদিদের ফলবান খেজুরগাছগুলিকে কেটে ফেলতে; কেননা, সেগুলি তাদের সন্তানদের মতোই প্রিয়। এইভাবে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যাবে। গাছ কাটা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু সাথে সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, মুসলিম বাহিনী বিজয়ের মুখোমুখি, এমতাবস্থায় আমরা কেন খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করব? একথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দ হল। সাথে সাথে তিনি খেজুর গাছ কেটে দেওয়া থেকে বিরত হওয়ার জন্য আদেশ পাঠালেন।

সন্ধ্যা বেলায় মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা রাজিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর ভাইয়ের শাহাদাত প্রাপ্তির ঘটনা নিবেদন করলেন।

www.nagorikpathagar.org

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আগামী দিন সেই ব্যক্তির হাতে ইসলামী বাহিনীর পতাকা তুলে দেওয়া হবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এ ছিল এমন একটি প্রশংসা, যা শুনে বড় বড় বীর সেনানীরা পরবর্তী দিনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

ওই রাতে বাহিনীর দেখভালের দায়িত্ব হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি ইতস্ততঃভাবে ঘুরতে থাকা এক ইহুদিকে গ্রেফতার করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলঅইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে এনে উপস্থিত করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাহাজ্জুদ নামাযে নিমগ্ন ছিলেন। নামায শেষে ইহুদিটির সাথে কথা বললেন। ইহুদি বলল ঃ 'আমার পরিবারের মহিলা ও শিশুরা ঐ দুর্গে অবস্থান করছে। তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি তাদের গোপন যুদ্ধ সরঞ্জামের কথা বলে দিতে পারি।' তার কাছ থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হল। ইহুদি বলল ঃ নুতাত দুর্গে যেখানে অস্ত্রশস্ত্র পুঁতে রাখা রাখা আছে, তা আমি জানি। মুসলমানরা নুতাত দুর্গ অধিকার করলে আমি তা বলে দেবো।'

সকাল হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী মুর্তজা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে স্মরণ করলেন। লোকেরা নিবেদন করল যে, 'তাঁর চোখ উঠেছে ও চোখে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।' হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহু এসে গেলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মুখের লালা নিয়ে তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন। সাথে সাথেই তাঁর চোখ সেরে গেল এবং যন্ত্রণাও দূরিভূত হয়ে গেল। তারপর বললেন ঃ 'আলী,যাও, আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করো। আলী! তোমার হাতে যদি একজন ব্যক্তিও মুসলমান হয়ে যায়, জেনে রেখো, তা প্রচুর পরিমাণে গনীমত হাসিলের চেয়েও বড় কাজ হবে।'

হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু নাঈম দুর্গে আক্রমণ শুরু করলেন। মোকাবিলার জন্য দুর্গের বিখ্যাত সরদার মারহাব ময়দানে নেমে এলো। সে নিজেকে হাজার বীরের সমকক্ষ বলে মনে করত।

তারপর মারহাবের ভাই ইয়াসির বেরিয়ে এলো। হযরত জুবাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর হযরত আলী মুর্তজা রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর নেতৃত্বে ব্যাপক আক্রমণের পর নাঈম দুর্গ বিজিত হল।

www.nagorikpathagar.org

ঐ দিনই হযরত হুবাব বিন মুঞ্জির রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহু সা'আব দুর্গ অবরোধ করলেন। এর তিন দিন পরে এ দুর্গও বিজিত হল। সা'আব দুর্গ জয় করে মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণে যব, খেজুর, ময়দা, মাখন, জয়তুন, চর্বি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লাভ করলেন। এর ফলে, মুসলমান শিবিরের অনেক রসদের অভাব দূর হয়ে গেল। এই দুর্গ থেকে দুর্গ ধ্বংসকারী অনেক সরঞ্জামও পাওয়া গেল। ইহুদি গুপ্তচর যার সন্ধান দিয়েছিল। তারপর দিন নুতাত দুর্গ অধিকার করে নেওয়া হল। এবার পাহাড়ি টিলার উপর অবস্থিত জুবায়ের দুর্গ– যেটি বানী জুবায়ের নামেও পরিচিত ছিল– সেটি অবরোধ করা হল। দু'দিন পরে এক ইহুদি ফৌজ ইসলাম গ্রহণ করল। সে বলল ঃ 'এক মাস ধরে চেষ্টা করলেও আপনারা এটি অধিকার করতে পারবেন না। আমি এক কৌশল বলে দিচ্ছি। নিকটবর্তী এক জমির নিচে দিয়ে এই দুর্গে পানি সরবরাহের রাস্তা আছে। সেটি বন্ধ করে দিতে পারলে সহজেই কেল্লা ফতে করা যাবে। মুসলমানরা তাইই করলেন। ফলে, দুর্গমধ্য থেকে লোকেরা বেরিয়ে খোলা ময়দানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে এলো। তাদের সহজেই পরাজিত করে মুসলমানরা দুর্গ অধিকার করে নিলেন।

এবার হিস্নে উবাই নামে দুর্গে আক্রমণ চালানো হল। এরাও কঠিনভাবে মোকাবিলা করল। তাদের মধ্য থেকে গজওয়ান নামক এক ব্যক্তি মোকাবিলার জন্য ময়দানে নেমে এলো। তার মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন হুবাব রাজিয়াল্লাহু আনহু। তার একটা হাত কাটা গেল। সে দুর্গমধ্যে পালিয়ে যেতে লাগল। হুবাব তার পিছু ধাওয়া করলেন। পুনরায় আক্রমণ করে তাকে জাহান্নামে পাঠানো হল।

দুর্গ থেকে আর এক জওয়ান বেরিয়ে এলো। তার মোকাবিলায় এক মুসলমান বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। এবার বেরিয়ে এলেন আবু দুজানা রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহু। তিনি অগ্রসর হয়েই তার পা কেটে ফেললেন, তারপর হত্যা করলেন।

ইহুদিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ফলে, তারা আর বাইরে আসতে সাহস পেল না। আবু দুজানা রাজিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হলেন। সাথে মুসলিম বাহিনীও চলল। তকবীর ধ্বনি দিয়ে দুর্গ আক্রমণ করা হল। কেল্লা ফতে হয়ে গেল। দুর্গবাসীরা পালিয়ে গেল। এই দুর্গ থেকে প্রচুর পরিমাণে বকরি, কাপড় ও আসবাবপত্র পাওয়া গেল।

www.nagorikpathagar.org

এবার মুসলমানরা হিসনে বিররা দুর্গে আক্রমণ হানলেন। সেই দুর্গের অধিবাসীরা মুসলমানদের উপর এত বেশি পরিমাণ পাথর ও তীর বর্ষণ করল যে, তার মোকাবিলায় মুসলমানরাও তোপ ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন। এ ছিল সেই তোপ যেটি মাআব দুর্গ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। তোপের আঘাতে দুর্গের দেওয়াল ধ্বংস করে দিয়ে তা অধিকার করে নেওয়া হল।

এ আলো ছড়িয়ে গেল সবখানে

এইভাবে হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে একে একে সমস্ত গোত্রেই ইসলামের দাওয়াত বেশ জোরে-শোরে পৌঁছে গেল; সমস্ত গোত্রের জন্যই ইসলাম গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। একদিকে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআনের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পবিত্র কুরআনের চলমান প্রতিবিম্ব। সেই সাথে তাঁর পবিত্র জীবন যাপন পদ্ধতি সমস্ত আরবের মন জয় করতে চলেছিল। অন্যদিকে ইসলামের প্রেরণায় মানুষের জীবন থেকে অন্ধকার যুগের ধ্যানধারণা বিদূরিত হয়ে চলেছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাক-পবিত্র জীবনের আলো ধীরে ধীরে আরবের দিক হতে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে তাঁর নেতৃত্বে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে চলল।

www.nagorikpathagar.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সম্রাটদের উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণের পত্র প্রেরণ

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও সাধনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সুফল বয়ে এনেছে। একদিন তিনি তাঁর সাথীদের সম্মানসূচক উপাধি দানের পর তাদের বললেন ঃ 'লোকসকল! আল্লাহতা'লা আমাকে সমগ্র দুনিয়ার জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন (আমার পয়গাম সমগ্র পৃথিবীর জন্য এবং তা সকলের জন্য রহমতস্বরূপ), ঈসার অনুসারীদের মতো পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ো না। যাও, আমার পক্ষ থেকে এই সত্যের আহ্বান সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।'

সেই সময়ে অর্থাৎ ০৬ হিজরি সনের শেষে অথবা ০৭ হিজরি সনের শুরুতে সে যুগের বড় বড় সম্রাটদের নামে পত্রও লিখলেন এবং সাহাবাদের মারফৎ তা ইসলাম-বিরোধী রাষ্ট্রগুলোর সম্রাটদের কাছে পাঠালেন। এসব পত্র অনেক ছোট ছোট দেশের সাথে সাথে রোম ও পারস্যের সম্রাটদের কাছেও পাঠানো হল।

মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত মোতাবেক সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, 'দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ হবে না এবং যেসব গোত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলতে চাইবে, তা তারা পারবে এবং যারা কুরাইশদের সাথে মিলতে চাইবে, তা তারা পারবে'– অর্থাৎ ইচ্ছামতো পক্ষাবলম্বন করতে পারবে।

এই শর্তানুসারে বনী খুজাআ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং বনী বকর কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

সন্ধিচুক্তি দু'বছর পূর্ণ হতে না হতেই বনু বকর বনু খুজাআদের উপর আক্রমণ চালাল এবং কুরাইশরা বনু বকরদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করল। ইকরামা বিন আবু জেহেল, সুহাইল বিন আমর (এরা সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল), সাফওয়ান বিন উমাইয়া (বিখ্যাত কুরাইশ নেতা) সমবেতভাবে বনু খুজাআদের উপর হামলা চালাল।

এই বেচারিরা শান্তি প্রার্থনা করল, পালিয়ে কাবা-ঘরে গিয়েও আশ্রয় নিল কিন্তু কোথাও তারা রেহাই পেল না। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের হত্যা

www.nagorikpathagar.org

করল। এই অসহায় মজলুমরা যখন কাতরভাবে 'ইলাহ-ক, ইলাহ-ক' (আল্লাহর ওয়াস্তে, আল্লাহর ওয়াস্তে) বলে জীবনভিক্ষা চাচ্ছিল, তখন এই জালিমরা বলছিল, 'লা-ইলাইল আউম' (অর্থাৎ আল্লাহ বলে কিছু নেই)।

মজলুমদের মধ্যেকার চল্লিশ ব্যক্তি প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছিল। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে সেই বেদনাদায়ক ঘটনার সমস্তটাই নিবেদন করল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন। তারপর তিনি কুরাইশদের কাছে এই বলে এক দূত পাঠালেন যে, কুরাইশরা এসব অপকর্ম থেকে বিরত হোক এবং প্রদত্ত তিন শর্তের মধ্যে যে কোনো একটি শর্ত মেনে নিক ঃ

১. বনু খুজাআদের যত লোক নিহত হয়েছে, তার রক্তপণ আদায় করুক

অথবা, ২. কুরাইশরা বনু বকরদের পরিত্যাগ করুক

অথবা, ৩. হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি প্রত্যাহার করুক।

দূতের কাছ থেকে এসব অবগত হওয়ার পর কুরাইশদের মধ্য থেকে কুর্‌তা বিন উমর নামে এক ব্যক্তি বলল ঃ 'তৃতীয় শর্ত মঞ্জুর।'

দূত চলে যাওয়ার পর তারা খুব আফসোস করল এবং পুনরায় আবু সুফিয়ানকে পাঠাল তা পুনর্বহাল করার জন্য। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের ব্যাপারে মোটেও নিশ্চিত ছিলেন না। সেজন্য তিনি আবু সুফিয়ানের এ দৌত্য প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

কাবাগৃহ নির্মিত হয়েছিল একান্তভাবে এক আল্লাহর উপাসনাগার হিসেবে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে এটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পৌত্তলিকরা তার পবিত্রতা বিনষ্ট করে সেখানে অগণিত মূর্তি স্থাপন করে; এবং তখনো পর্যন্ত তা ছিল পৌত্তলিকদের কব্জায়। তা শিরক ও অংশীবাদের সবচেয়ে বড় আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্রাহীমী দীনের পুনরুজ্জীবন সাধনের নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেককাল ধরেই অনুভব করছিলেন এক আল্লাহর উপাসনার জন্য নির্মিত এ কাবাগৃহকে পৌত্তলিকতার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে তাকে পবিত্র গৃহে উন্নীত করা প্রয়োজন; কিন্তু তখনো পর্যন্ত পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্তের মধ্যে আসেনি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুভব করলেন, দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সাধনা আজ সফল হতে চলেছে। এখন

www.nagorikpathagar.org

সেই পবিত্র ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে, যে সময়ে আল্লাহর পবিত্র গৃহ থেকে অপবিত্র মূর্তিরাজিকে উৎপাটন করে দিয়ে তার পূর্ব পবিত্রতা আনয়ন করা। এই উদ্দেশে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুগত গোত্রগুলির কাছে তাঁর প্রস্তুতির খবর পাঠালেন এবং এও বলে পাঠালেন যে, মক্কাবাসীরা যেন এ প্রস্তুতির কিছুই জানতে না পারে।

প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০ রমজান তারিখে দশ হাজার জানিসারীর এক সুদক্ষ বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। তাঁর অনুগত আরব গোত্রগুলিও পর্যায়ক্রমে তাতে যোগদান করল।

মক্কার নিকটবর্তী স্থানে পৌছে ইসলামী বাহিনী কুরাইশ বাহিনীর নেতৃত্বে অবস্থানকারী আবু সুফিয়ানকে গ্রেফতার করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পেশ করলেন।

এ সেই আবু সুফিয়ান, যে অনবরত ইসলামের বিরোধিতা করে এসেছে, বারে বারে মদীনা আক্রমণের চক্রান্তে লিপ্ত থেকেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীর পক্ষ থেকে বার বার নেতৃত্ব দিয়েছে, শুধু তাই নয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে বার বার হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ রকম অগণিত অপরাধের দায়ে আবু সুফিয়ানের মৃত্যুদণ্ডই ছিল যথাযোগ্য শাস্তি কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্দী আবু সুফিয়ানের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন ঃ 'যাও, তুমি মুক্ত। তোমার কৃতকর্মের কোনো কৈফিয়ৎ আজ তোমার কাছে চাওয়া হবে না। আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। তিনি সবার চেয়ে দয়ালু, সবার চেয়ে করুণাময়।'

আবু সুফিয়ানের কাছে ছিল এ এক আশ্চর্য ও অদ্ভুত ব্যাপার। তার অতীত ক্রিয়াকর্মের বিচারে এ ছিল সীমাহীন অনুগ্রহ, উদারতা ও ক্ষমার সবচেয়ে বড় নিদর্শন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আচরণে আবু সুফিয়ানের আত্মা বিকশিত হয়ে উঠল। সে যেন ইসলামের করুণাসাগরে সিনান করে এইমাত্র পাকপবিত্র হয়ে উঠল। সে তার সমস্ত হৃদয়মনপ্রাণভরা অনুভূতি দিয়ে স্পষ্টভাবেই অনুভব করল, এ বাহিনী শান্তির বাহিনী; মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাহিনী। রক্তপ্রবাহের জন্য নয়; এ বাহিনী এসেছে মনুষ্যত্ব, মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বাদশাহী কায়েম করতে আসেননি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অযাচিত অনুগ্রহ ও করুণাধারায় সিক্ত আবু সুফিয়ানের আর কোন মুখ নিয়ে, কোন নিরাপত্তা

www.nagorikpathagar.org

ও কোন শান্তির আশ্বাসে আর কোথায় ফিরে যাওয়ার মতো জায়গা ছিল? ক্ষমাপ্রাপ্ত ও মুক্ত আবু সুফিয়ান ফিরে এলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণা ও সহানুভূতির ছায়াতলে। পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে আবু সুফিয়ান ধন্য হয়ে গেল– এখন সে ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ জানিসার বাহিনীরই একজন সৈনিক।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছা ছিল যে, এ ঘটনা যেন মক্কাবাসীরা জানতে না পারে। বাস্তবিকই তাই হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করে যখন তা অধিকার করে নিলেন তখন তারা খবর পেলো।

পরদিন প্রভাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে শহরে প্রবেশের আদেশ দিলেন। সেই সাথে নিম্নলিখিত আদেশগুলি কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দিলেন ঃ

১. অস্ত্র সমর্পণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।
২. কাবা গৃহে আশ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।
৩. নিজগৃহে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।
৪. আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।
৫. হাকিম বিন হিজামের গৃহে আশ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।
৬. পলাতক ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করবে না।
৭. আহত ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।
৮. বন্দীকে হত্যা করবে না।

শহরের এক প্রবেশ পথে খালিদ বিন অলীদের (রাঃ) নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সাথে মক্কাবাসীদের সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়, পরে তারা পালিয়ে যায়। এ ছাড়া আর কোনো বাধা আসেনি। এইভাবে সকলেই মক্কায় প্রবেশ করলেন।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০ রমজান তারিখে যে সময়ে শহরে প্রবেশ করেছিলেন; সে সময়ে তিনি উটের পিঠে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে পবিত্র কুরআন পাঠ (সূরা ঃ ফাত্হ) করছিলেন। উটের পিঠে বসে তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে গমন করছিলেন, তাঁর উটের পিঠে তাঁর মুক্ত করে দেওয়া দাস জায়েদের পুত্র উসামা বিন রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বসিয়ে রেখেছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি প্রথমেই আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করলেন। সে সময়ে সেখানে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতুড়ির আঘাতে এক একটি মূর্তিকে গুঁড়িয়ে

www.nagorikpathagar.org

দিচ্ছিলেন আর পবিত্র কণ্ঠ হতে উচ্চারণ করছিলেন, 'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। নিশ্চয় মিথ্যা অপসৃত হওয়ার যোগ্য।' –(বনী ইসরাঈল, রুকু ৯)

হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয় ও কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসরত পৌত্তলিক গোত্রগুলি খুবই ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এরা কুরাইশদের শত্রু বলে মনে করত। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় এরা না কুরাইশ, না মুসলমান কারো পক্ষই অবলম্বন করেনি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোত্র দুটি হাওয়াজিন ও সকীফ গোত্র নামে পরিচিত ছিল।

মুসলমানদের মক্কাবিজয় ও কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের পর এরা আশঙ্কা করল যে, এবার তাদের উপর হামলা হবে। এই আশঙ্কায় তারা বিপুল সংখ্যক সৈন্যের এক বাহিনী মোতায়েন করল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ শোনামাত্রই নিজেও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি দশ হাজার মুহাজির ও আনসার সাথে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় এসেছিলেন, এর সাথে মক্কা থেকে আরো দু'হাজার লোক সহ বারো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে রওনা হলেন।

এদিকে মুসলমান সৈন্যদের হুনাইন উপত্যকার কাছাকাছি স্থানে পৌঁছানোর খবর শুনে শত্রুসৈন্যরা উপত্যকার দুই দিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুপ্তঘাঁটিতে অপেক্ষা করতে লাগল।

মুসলমানরা সন্ধ্যার মুখোমুখি সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হতেই শত্রুরা প্রবল বিক্রমে তীর বর্ষণ শুরু করল। এই হঠাৎ আক্রমণে মুসলমানরা ঘাবড়ে গিয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার নেতৃত্বে রয়েছেন সেই বাহিনীকে হারানো অত সহজ? তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর আশে-পাশের অল্পসংখ্যক সৈন্যকে বাদ দিয়ে মুসলমানরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ঘোষণা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত বাহিনীকে তাঁর কাছে চলে আসার নির্দেশ জারি করলেন। সাথে সাথে মুসলমানরা তাই করলেন এবং নির্দেশমতো প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল ঃ

www.nagorikpathagar.org

তাদের সেনাপতি মালিক বিন আউফ তার যুদ্ধরত পুরুষ সৈন্যদের নিয়ে তায়েফ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল।

দ্বিতীয় দলটি যাতে মাল-মাত্তা ও মহিলা ও শিশুরা ছিল তারা আউতাস উপত্যকায় পালিয়ে গেল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ দুর্গ অবরোধ করার হুকুম দিলেন এবং আবু আমীর আশআরী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে আউতাস অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে শত্রুদের বাল-বাচ্চা সহ সমস্ত ধন-সম্পদ অধিকার করে নিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর জানার পর দুর্গের অবরোধ তুলে নেওয়ার হুকুম দিলেন। কেননা, তাদের বাল-বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখাটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আউতাসে ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার বকরি, চার হাজার উকিয়া রূপা, ৬ হাজার মহিলা ও শিশু মুসলমানদের অধিকারে এসে গিয়েছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো রণক্ষেত্রেই অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে হাওয়াজিন গোত্রের ছয় নেতা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন।

এদের মধ্যে সেই লোকেরাও ছিল যারা তায়েফে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নির্মমভাবে পাথর বর্ষণ করেছিল। হযরত জায়েদ রাজিয়াল্লাহুহু তা'লা আনহু প্রিয়নবীকে সেখান থেকে বেহুঁশ অবস্থায় উঠিয়ে এনেছিলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হাঁ, আমি স্বয়ং তোমাদের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলাম; এবং তোমাদের অপেক্ষায় দু' সপ্তাহ আগে অধিকৃত মালামাল এখনো ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি।

আমি আমার নিজের এবং আমার বংশের লোকেদের অংশের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দিতে পারতাম; এমনকি যদি আমার সাথে কেবল মুহাজির ও আনসাররাও থাকত, তাহলেও সবাইকে ছেড়ে দিতে পারতাম কিন্তু তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ যে, বাহিনীতে আমাদের সাথে অন্য লোকেরাও এসেছে; এরা সব নও-মুসলমান; সেজন্য একটি উপায় বের করা খুবই জরুরী। তোমরা কাল সকালে নামাযের পরে এসে তোমাদের আবেদন পেশ কোরো। সে সময় কোনো উপায় বেরিয়ে আসবে।' তারপর বললেন ঃ 'তোমরা সম্পদ অথবা বালবাচ্চা যেটা পছন্দ করবে সেটা নেবে; কেননা, আক্রমণকারী ফৌজদের বঞ্চিত করা মুশকিল হয়ে পড়বে।'

www.nagorikpathagar.org

পরদিন ঐ সরদাররাই এলো এবং তারা প্রকাশ্যে তাদের সকল বন্দীকেই মুক্তি দানের জন্য আবেদন জানাল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'বনু আবদুল মুত্তালিব ও আমার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বন্দীদের মুক্তিদান করছি।'

আনসার ও মুহাজিররা বলল ঃ 'আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছি।'

বাকী রয়ে গেল বনু সুলাইম ও বনু ফুজ্জার। আক্রমণকারী শত্রুদের উপর (সৌভাগ্যবশত যাদের পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে) এমন অদ্ভুত করুণা ও বদান্যতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল; এমনটি তাদের কাছে ছিল অবিশ্বাস্য ব্যাপার; সেজন্য তারা তাদের অংশের বিনিময়ে তাদের অংশের বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজি হল না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আহ্বান করলেন। তাদের অংশের হিসেবে প্রতি বন্দী পিছু ছয় উট দাঁড়াল। এর বিনিময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। এইভাবে সমস্ত বন্দী মুক্তিলাভ করল।

এই বন্দিনীদের মধ্যে প্রিয়নবীর দুধমাতা হালিমার কন্যা শায়মা বিনতে হারিসও ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুধবোন রূপে চিনতে পারলেন এবং তাকে বসার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'তুমি যদি আমার কাছে থেকে যেতে চাও তো খুব ভালো। ফিরে যাওয়াটাও তোমার ইচ্ছা।' সে ফিরে যেতে চাইল। তিনি তাকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

গনীমতের মাল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই বণ্টন করে দিলেন। বেশি অংশ তাদের দিলেন, কিছুদিন পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আনসারদের তিনি কিছুই দিলেন না। বললেন ঃ 'আমি স্বয়ং আনসারদের সাথী। লোকেরা ধন-সম্পদ নিয়ে যার সেই ঘরে ফিরে যাবে এবং আনসাররা আল্লাহর নবীকে নিয়ে তাদের ঘরে প্রবেশ করবে।'

এ ঘোষণায় আনসাররা যে আনন্দ পেয়েছিলেন, সে আনন্দ সম্পদের ভাগীদাররা লাভ করতে পারেননি।

তাবুকের যুদ্ধ

আরবদেশের উত্তরাংশটি বিশাল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্ব থেকেই রোম সাম্রাজ্যের সাথে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল।

www.nagorikpathagar.org

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত গোত্রগুলির কাছে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে পত্রমারফৎ তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান এবং এরা রোমক সম্রাটের অধীনতা মেনে চলত। এরা সেই প্রতিনিধিদলের পনেরো ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। এদের কবল থেকে দলনেতা হযরত সাদ বিন উমাইর গিফারি রাজিয়াল্লাহুতা'লা আনহু কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। ঐ যুগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসরার নেতা শুরাহবিলের কাছেও পত্র মারফত ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে-ও প্রিয়নবীর প্রেরিত দূত হযরত হারিস বিন উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছিল। এই সরদারও রোম সম্রাটের অধীনতা মেনে চলত। এসব কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ০৮ হিজরি সনের জুমাদল উলা মাসে তিন হাজার মুসলমানের এক বাহিনী সিরিয়ার সীমান্তে প্রেরণ করেন, যাতে মুসলমানদের তারা কোনো অবস্থাতেই দুর্বল ভেবে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার সাহস না পায়।

মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর জানতে পেরে শুরাহবিলও প্রায় এক লাখ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল। কিন্তু এ সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও মুসলমান বাহিনী অগ্রসর হতে লাগল।

রোমান সম্রাট কায়সার সে সময় হপস নামক জায়গায় অবস্থান করছিল। সে-ও তার ভাই থিয়োডরের নেতৃত্বে লক্ষাধিক সৈন্য পাঠিয়ে দিল। এদিকে মুসলমানরাও অগ্রসর হতে লাগলেন। মুতা নামক স্থানে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য বিশাল রোমীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। আপাতদৃষ্টিতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, দু' লক্ষাধিক সৈন্যের সামনে মাত্র তিন হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী খড়কুটোর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এত বিশাল বাহিনী ক্ষুদ্র মুসলিম-বাহিনীর কাছে তুলোধোনা হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এভাবে পরাজিত হল বিশাল রোমক বাহিনী।

পরের বছরই কায়সার মুতার যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ শুরু করল এবং নিজের অধীনস্থ আরব গোত্রগুলিকে একত্রিত করে নিজের বাহিনীতে ভর্তি করতে লাগল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যথারীতি সে খবর জানতে পারলেন। এ ছিল মুসলমানদের জন্য বড়ই নাজুক অবস্থা। ঐ কঠিন সময়ে

www.nagorikpathagar.org

যদি সামান্য অলসতাকেও প্রশ্রয় দেওয়া হত তাহলে ঐ সময়েই ইসলাম দুনিয়ার বুক থেকে চিরকালের জন্য মুছে যেতে পারত। একদিকে তো আরবের সেই অবদমিত গোত্রগুলিইমাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করত, যারা মাত্র কিছুদিন আগেই হুনাইনের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। অন্যদিকে ছিল মদীনার মুনাফিকরা, যারা বাইরে মুসলমানদের সাথী হওয়ার ভান করত কিন্তু গোপনে ইসলামের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত, এরা এই সুযোগে মুসলমানদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে সমর্থ হলে তা সামলানো বড়ই কঠিন হয়ে পড়ত। এমতাবস্থায়, বিশাল রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ত এবং তিন শত্রুর চাপ সহ্য না করতে পেরে মুসলমানদের পরাজয়ের মুখে পড়তে হতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অবশেষে ঘোষণা করলেন ঃ 'কায়সারের এ সামরিক শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। কেননা, এ পরিস্থিতিতে সামান্য দুর্বলতা দেখালে ইসলামের সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

বিশালতর কোনো সামরিক প্রস্তুতির জন্য ঐ সময়টা মোটেও সুবিধাজনক ছিল না। সারা দেশে তখন শুষ্ক মওসুম বিরাজ করছিল। প্রচণ্ড গরমে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ফসল পাকার মৌসুম চলছিল। যুদ্ধের সরঞ্জামও পর্যাপ্ত ছিল না। এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে সবকিছু বিবেচনা করে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ঘোষণা দিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, কোথায় যেতে হবে, এবং কী করতে হবে।

অবশেষে ত্রিশ হাজারের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে তাবুক অভিমুখে প্রস্থান করলেন। তিনি তাঁর অবর্তমানে সাবাআ বিন আতাইফাকে মদীনার শাসনকর্তার পদে এবং হযরত আলী মুর্তাজা রাজিয়াল্লাহ তা'লা আনহুকে আহলে বাইয়াত-এর দায়িত্বে রেখে গেলেন।

বাহিনীতে সওয়ারির বড়ই অভাব ছিল। প্রতি ১৮ ব্যক্তির জন্য মাত্র একটি করে উটের ব্যবস্থা ছিল। রসদের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে গাছের পাতা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে হল। এর ফলে, তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পানির অভাব পড়েছিল পদে পদে, তাই উট জবাই করে তার গর্ভে রক্ষিত পানি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে হয়েছিল (যদিও সওয়ারির জন্য উটের সংখ্যা আগে থেকেই কম ছিল)।

সীমাহীন ধৈর্য, ত্যাগ, পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্য দিয়ে মুসলিম বাহিনী অবশেষে তাবুক পৌঁছে গেল।

www.nagorikpathagar.org

তাবুক পৌঁছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মাস যাবৎ অবস্থান করলেন। এর পরিণামে সিরিয়াবাসীরা খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তাদের সাহস হল না। বাধ্য হয়ে তারা বশ্যতা স্বীকার করল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে 'সূরা আত-তাওবা' অবতীর্ণ হল। এর মাধ্যমে সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন গুরুত্বপূর্ণ সব আদেশ-নির্দেশ দিলেন, মদীনায় ফিরে আসার পর প্রিয়নবীকে তা পূর্ণমাত্রায় আমল করতে হল। এতদিন পর্যন্ত মুনাফিকদের সাথে অত্যন্ত মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে আসা হচ্ছিল। এর পরিণামে তাদের কুপ্রবৃত্তিগুলি যেন মাঝে-মধ্যে বিষাক্ত সাপের মতো ফণা তুলতে চাচ্ছিল। তাবুক অভিযানের সময় এরা প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোগী হতে চায়নি কেবলমাত্র নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি ও জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। তাবুক অভিযানের পর মদীনায় ফিরে এসে তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্ণরূপে শুধরে নিয়ে ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার আদেশ দেওয়া হল। এমন কি তাদের সাথে কঠিন ব্যবহারের এমন কি প্রকাশ্য প্রমাণ ব্যতীত তাদের আর মুসলমান বলে মেনে নেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হল। তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তার জানাজা পড়াতে নিষেধ করা হল। এমন কি তাদের সাথে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত সম্পর্ক রাখার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

চর্তুদশ অধ্যায়
আখেরী হজ্ব

হজ্ব ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

হজ্ব ফরজ হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হয়েছিল ০৫ হিজরি সনে। এই বছরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুকে আমীর নির্বাচিত করে তিন শ' সাথীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে হজ্বে পাঠান যাতে তাঁর নেতৃত্বে এঁরা হজ্ব পালন করে আসেন।

হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বের সাথে সাথে হযরত আলী মুর্তজা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে অন্য একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়। হজ্বের সমাবেশে তাঁকে সূরা বারাআতের (৪০ আয়াত পর্যন্ত) আয়াতগুলি পড়ে শুনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যাতে হজ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে; এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জরুরী কর্তব্যকর্মগুলিকে ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেখানে ঘোষিত বিধিবিধানগুলি নিম্নরূপ ঃ

❑ যে লোকেরা অন্ধকার যুগের শিরক বা অংশীবাদকে অনুসরণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা ইসলামের সাথে চুক্তি সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল, তাদের সামনে ঘোষণা করে দেওয়া হল যে, চার মাসের মধ্যে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক সমস্ত চুক্তির অবসান হয়ে যাবে। এর মধ্যে তারা ঠিক করে নিক যে, তারা কোন পথ অনুসরণ করবে বা তাদের কী করা উচিত। এ ছিল সেই পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘোষণা, যারা সন্ধির সময় সন্ধির শর্ত না মেনে ইসলাম-বিরোধী শত্রুদের সাথে যোগ দিয়ে বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছিল।

❑ যে পৌত্তলিকরা চুক্তির শর্তানুযায়ী মুসলমানদের সাথে সততা বজায় রেখে চলেছিল, এ চুক্তি তাদের ক্ষেত্রে বহাল থাকবে।

❑ একথাও ঘোষণা করা হল যে, কোনো পৌত্তলিক আর কখনো কাবাগৃহ ও মসজিদের মুতাওয়াল্লী হতে পারবে না।

❑ আর কোনো পৌত্তলিক কাবাগৃহের সীমানা পর্যন্ত যেতে পারবে না এবং তাদের রীতি অনুযায়ী উপাসনাও করতে পারবে না।

❑ পৌত্তলিকদের নিয়মানুযায়ী আর কেউ কখনো উলঙ্গ হয়ে কাবাগৃহ পরিক্রমা করতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

❑ আগামী চার মাস পরে আল্লাহর তরফ থেকে এই নীতি সর্বাত্মকভাবে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হল। অর্থাৎ পৌত্তলিকদের জন্য কাবার দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল।

বিদায় হজ্জ

১০ হিজরি সনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সর্বত্রই জানিয়ে দেওয়া হল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্বে যাবেন। এ খবর শোনা মাত্রই লোকেরা দলে দলে মদীনায় এসে জমা হল। এতে সব মর্যাদার এবং সমস্ত পর্যায়ের মানুষ এসে যোগ দিলেন।

জুলহুলাইফায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এহরাম বাঁধলেন এবং এখান থেকেই 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লা শরীকা-লাকা লাব্বাইক ইন্নালহামদ ওয়ান্নি মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক লা শরীকা লাকা' উচ্চারণ করলেন এবং এহরামের সাথে মক্কা মুআজ্জমার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

রাস্তায় প্রতিটি জায়গা থেকে এই পবিত্র কাফেলার লোকেরা দলে দলে যোগ দিতে লাগল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তায় প্রতিটি টিলা অতিক্রম করার সময় তিন বার করে উপরোক্ত দোয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে লাগলেন।

তারপর মক্কার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত জিতুওয়ায় কিছু সময়ের জন্য অবস্থানের পর সেখান থেকে পুনরায় যাত্রা করে মক্কায় প্রবেশ করে দিনের আলো থাকতে থাকতেই কাবা শরীফ তাওয়াফ করে নিলেন।

কাবা শরীফ তাওয়াফের পর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে গেলেন; তার উপরে উঠে পবিত্র কাবা গৃহের পানে মুখ করে তকবীর ধ্বনি দিলেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে এই দোয়া পাঠ করলেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শরীকালাহু-লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু আনজাজ্ ওয়াদুহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাজামাল আহজাব ওয়াদাহু।'

আট জিলহজ্ব তারিখে মক্কা থেকে মীনায় গিয়ে অবস্থান করলেন। জুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামাজ মীনাতেই পড়লেন।

নয় জিলহজ্ব তারিখে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রভাতের পর নামিরা উপত্যকায় এসে নামলেন। ঐ উপত্যকার এক প্রান্তে অবস্থিত আরাফাতের ময়দানে এসে পৌঁছালেন। তাঁর লক্ষাধিক অনুগামী

www.nagorikpathagar.org

সাথে সাথে সেখানে গিয়ে অবস্থান নিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হতে লাগল তাকবীর তাহলীল, তাহমীদ ও তকদীস। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সেখানেই উপস্থিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের উপর উঠে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন ঃ

❑ উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি যা কিছু বলি, তা গভীর মনোযোগ সহকারে শোনো। কেননা, ভবিষ্যতে আমি এখানে আর কখনো তোমাদের সাথে মিলিত না-ও হতে পারি।

❑ ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের রক্ত, তোমাদের জানমাল, তোমাদের ইজ্জৎ-সম্ভ্রম একে অন্যের জন্য এমনভাবে হারাম ঘোষণা করা হল, যেমনটি এই নামে এই পবিত্র শহরে সবাই সবার জন্য নিরাপদ। ভ্রাতৃবৃন্দ! খুব সত্বরেই তোমাদের আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে। এবং তিনি তোমাদের কর্মফল সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।

❑ লোকসকল! অন্ধকার যুগের সকল কুসংস্কারকে আজ পদদলিত করা হল। অন্ধকার যুগের সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘোষণা করা হল। প্রথম রক্তপণ, যা আমার বংশের অর্থাৎ ইবনে রবীআ বিন হারিসের রক্ত, যে বনী সাদ গোত্রের দুধ পান করেছিল এবং হুজাইল যাকে হত্যা করেছিল, সে রক্তপণ আমি ত্যাগ করছি। অন্ধকার যুগের সুদপ্রথার অবসান ঘোষণা করা হল। প্রথম সুদ আমার বংশের, তা আমি শোধ করে দিচ্ছি, তা আব্বাস বিন মুত্তালিবের সুদ, তার সমস্তটাই ছেড়ে দেওয়া হল।

❑ লোকসকল! নিজের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি ভয় রাখো। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছো আল্লাহর কালামের বিনিময়ে যারা তোমাদের জন্য হালাল বলে গৃহীত। তোমরা তাদের সকলের সাথে সমানভাবে সদাচরণ করবে (বেশি কম করবে না)। ... মহিলাদের তোমাদের প্রতি এতটাই অধিকার যে, তোমরা তাদের ভালোমতো পোষাক-পরিচ্ছদ দেবে এবং ভালো পানাহার করাবে।

❑ আমি তোমাদের জন্য সেই বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে থাকলে কেউ তোমাদের বিপথগামী করতে পারবে না, তা আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ।

❑ লোকসকল! আমার পরে আর কোনো পয়গাম্বর নেই; কোনো উম্মতও পয়দা হবে না। মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা সদাপ্রভুর উপাসনা করবে এবং সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। সারা বছরের মধ্যে রমজানে মাসব্যাপী রোজা রাখবে। খুশি ও আন্তরিকতার

www.nagorikpathagar.org

সাথে নিজেদের সম্পদের জাকাত দেবে। আল্লাহর গৃহে হজ করবে এবং আমানত রক্ষা করবে ও সুবিচার করবে। এসবের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবেন।

❑ লোকসকল! কেয়ামতের দিন আমার ব্যাপারে তোমাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে। তোমরা বলো, এর জবাবে তোমরা কী বলবে?

সবাই বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর হুকুম আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি নবুয়ত ও রিসালাতের হক পূর্ণভাবে আদায় করেছেন। আপনি তা সম্পূর্ণভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। (সে সময়ে) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদত আঙুল তুললেন এবং তা একবার আল্লার দিকে ও একবার উপস্থিত জনতার দিকে ওঠাতে এবং নামাতে লাগলেন। (তারপর) বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি শুনে নাও (তোমার বান্দারা কী বলছে)। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো (এ লোকেরা কী সাক্ষ্য দিচ্ছে)। হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকো (যে, এরা কী পরিষ্কারভাবে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে)।

❑ দেখো। যারা উপস্থিত আছো, যারা উপস্থিত নেই এ বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দিও। বিশ্বাস যে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক তা গ্রহণ করবে এবং তা স্মরণ রাখবে ও হেফাজত করবে– প্রচারে অংশ নেবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লামের অন্তিম রোগাবস্থা ও ওফাত

২৯ সফর, সোমবার। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জানাজা থেকে ফিরে আসছিলেন। পথেই তাঁর রোগযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, পরে খুব জ্বর এলো।

হযরত আবু সঈদ খুদরি রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এত বেশি জ্বর এসেছিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় যে রুমালটি বাঁধা ছিল, সেটিও উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শরীর এতটাই গরম ছিল যে, তাতে হাত রাখা যাচ্ছিল না।

রোগাবস্থায় ১১ দিন পর্যন্ত মসজিদে এসে তিনি নিজেই নামায পড়ালেন। সর্বমোট ১৩ বা ১৪ দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

পরের সপ্তাহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহার ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহুতা'লা আনহা বলেন, যখনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো রোগব্যাধি হত, তখন তিনি এই দোয়া পড়তেন, এবং নিজের সমস্ত শরীরে হাত বোলাতেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

'আজহিবিল বা'স রাবিন্নাস ওয়াশীফ আন্তাশশাফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফাউকা শিফাআল লা য়ুগাদিরু সাকমান।'

অর্থাৎ ঃ হে মানুষের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারি! বিপদ দূর করো। নিরাময় দানকারী তুমিই অতএব নিরাময় দান কর। এমনই নিরাময় দাও যেন কোন রোগ বালাই না থাকে।

অসুস্থতার দিনগুলিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দোয়া পড়তেন এবং সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিতেন। হাত বোলানো শেষ হলে বলতেন ঃ

'আল্লাহুম মাগফিরলি ওয়া আল্হিকনী বির রা ফীকিল আলা।'

শনিবার বা রবিবারের কথা। হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহুহু আনহুর ইমামতিতে জুহরের নামায হচ্ছিল। এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আব্বাস ও হযরত আলী মুর্তজা রাজিয়াল্লাহু আনহুম কাঁধে ভর করে নামায পড়তে এলেন। হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরে পিছু হটতে চাইলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারায় নিষেধ করলেন। তারপর হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর বরাবরে বসে নামাযে শরীক হয়ে গেলেন। এবার আবুবকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু আনহু, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইকতিদা করছিলেন আর বাকী লোকেরা হযরত আবুবকরের তকবীরের সাথে সাথে নামায আদায় করতে লাগলেন।

সোমবার ফজরের নামাযের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার ঘরের মধ্য থেকে পর্দা উঠিয়ে দেখলেন। সে সময়ে মসজিদে তাইবায় ফজরের নামায হচ্ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পবিত্র দৃশ্যটি গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এ ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার ফল। এ দৃশ্য দেখে তাঁর মধ্যে খুশির ঝলক বয়ে গেল, চেহারা ঝলমলিয়ে উঠল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা তাঁর সাথীদের মধ্যে গভীর শোক ও চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রিয়নবীর চেহারায় এ আলোর ঝলক দেখে তাঁদেরও হৃদয়মনপ্রাণ হেসে উঠেছিল। হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ প্রিয়নবীর নামায পড়ার ইচ্ছা। তিনি তৎক্ষণাৎ পিছু হটতে চাইলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইশারায় নিষেধ করলেন। সবাই তা বুঝতে পারলেন। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়া সাল্লাম পর্দা ফেলে দিলে হযরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু নামায শেষ করলেন।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে আর কোনো নামাযের ওয়াক্ত আসেনি।

বেলা বাড়তে লাগল। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা রাজিয়াল্লাহুতা'লা আনহাকে দুনিয়ার সমস্ত নারীদের নেত্রী হওয়ার সুসংবাদ দান করলেন। হযরত ফাতিমা রাজিয়াল্লাহু আনহা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ 'উহ্। আমার আব্বার কী কষ্ট!'

প্রিয়নবী বললেন ঃ 'এরপর তোমার আব্বা আর কোনোদিন কষ্ট পাবেন না।'

তারপর হযরত হাসান ও হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহুমকে ডাকলেন। দু'জনকে চুমু দিলেন এবং আদর করলেন।

তারপর পবিত্র জীবনসঙ্গিনীদের আহ্বান করলেন এবং তাঁদের উপদেশ দান করলেন।

তারপর হযরত আলী রাজিয়াল্লাহুতা'লা আনহুকে ডাকলেন। তিনি তাঁর পবিত্র মাথা আলীর কোলের উপরে রাখলেন। তাঁকেও উপদেশ দান করলেন এবং উচ্চারণ করলেন ঃ

'আসসালাতু আসসালাতু ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম।'

অর্থাৎ ঃ (স্মরণ রেখো) নামাজ, নামাজ এবং অধীনস্থদের প্রতি।

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ অসিয়ত ছিল এইটি।

হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি এই উক্তি বেশ কয়েকবার করেন।

জীবনের শেষ ক্ষণটি ঘনিয়ে আসতে লাগল। সে সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার সহায়তায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। পানির পাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেই রাখা ছিল। তিনি তাতে বার বার হাত ডোবাতে লাগলেন এবং নিজের শরীরে ফেরাতে লাগলেন। পবিত্র চেহারা কখনো লাল আর কখনো ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল। পবিত্র কণ্ঠ হতে উচ্চারণ করতে লাগলেন ঃ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইন্না লিল মৌতি সাকারাত।'

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। মৃত্যুযন্ত্রণা বড়ই কঠোর।

এমন সময় আবদুর রহমান বিন আবুবকর রাজিয়াল্লাহুহু আনহু এসে গেলেন। তাঁর হাতে ছিল টাটকা মিসাওয়াক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি সেদিকে নিক্ষিপ্ত হল। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিয়াল্লাহু আনহা তা নিজের দাঁতে চিবিয়ে নরম করে দিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসাওয়াক করলেন এবং হাত বাড়িয়ে পবিত্র মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ

'আল্লাহুম্মাররাফীকল আ'লা।'

হাত ঐ অবস্থাতেই রয়ে গেল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহলোক ত্যাগ করলেন।

১১ হিজরি সনের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার, সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে সময় তাঁর পবিত্র দেহ হতে রুহ অন্তর্হিত হয়ে গেল। সে সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর ৪ দিন।

'ইন্না লিল্লাহি অইন্নাইলাইহি রাজেউন আ-ফা-ইম মিততা ফা হুমুল খালেদুন।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হল।

মৃতদেহ সেখানেই রাখা হল যেখানে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল। পারস্পরিকভাবে তাঁর নামাযে জানাজা পড়া হল। প্রথমে আত্মীয় স্বজন, তারপর মুহাজির, তারপর আনসার পুরুষ, নারী ও শিশুরা নামাযে জানাযা আদায় করলেন, এ নামাযে কেউ ইমাম ছিলেন না। পবিত্র গৃহ ছিল ছোট। তাই দশ জন করে ব্যক্তি ভিতরে গিয়ে জানাজা শেষ করে বেরিয়ে আসতে লাগলেন। পর্যায়ক্রমে এইভাবে জানাযা শেষ হলো।

সারা দিন ও রাত ধরে এই ক্রম জারি রইল। অর্থাৎ ওফাতের বত্রিশ ঘণ্টা পরে তাঁর দাফন সম্পন্ন হল এবং আগামী কেয়ামত পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করবেন।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বাঙ কম্প্রিন্ট এন্ড পাব্লিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ফোন :৭১১১৯৯৩

www.nagorikpathagar.org